আমার বাংলাদেশ

তাকাশি হায়াকাওয়া



জাপানি সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী তাকাশি হায়াকাওয়া
১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য
টোকিওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা তোলেন;
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন,
কাজ করেন স্বাধীন বাংলাদেশকে জাপানের
স্বীকৃতির ব্যাপারে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭—চারবার
বাংলাদেশ সফরের স্মৃতি ধরা আছে এই বইয়ে। শেখ
মুজিবুর রহমান তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ
করেছেন, হায়াকাওয়াকে তিনি উল্লেখ করেছেন বন্ধু বলে।
বাংলাদেশকে তিনি ভালোবেসেছেন নিজের
দেশের মতো, বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসায়
মুগ্ধ হয়ে উত্তর পেয়েছেন এই প্রশ্নের—
'বাংলাদেশে গেলে সবাই
বাংলাদেশের প্রেমে পড়ে যায় কেন?'

ISBN 978 984 8765 78 4



১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তখন আমার স্বামী টোকিওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ হন। সেটাই ছিল তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের সূত্রপাত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেন এবং জাপান সরকার যাতে স্বাধীন বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয়, সেই উদ্দেশ্যে অধীর আগ্রহে কাজ করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাপান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রথম বাংলাদেশে যান। এরপর বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও গভীর হয়। তিনি বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করতেন। জাপানে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ভোটারদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এত বেশি বাংলাদেশের কথা বলতেন যে তাঁর সঙ্গীরা ভোট জোগাড় করার জন্য বাংলাদেশের প্রসঙ্গ ভাষণে কম তুলে ধরার অনুরোধ করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু তিনি বলতেন, 'বাংলাদেশ আমার দ্বিতীয় দেশ, আমি আমার নিজের দেশের কথা বলব না কেন?'

—মোতোয়ে হায়াকাওয়া



প্রতিকৃতি : আহমেদ শামসুদ্দোহা

তাকাশি হায়াকাওয়া

জন্ম ১৯১৬, জাপানের ওয়াকাইয়ামা জেলায়। পড়াশোনা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। ১৯৪১ ও ১৯৪৫ সালে দুবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি শুরু করেন এবং চাকরি ছাড়েন। ১৯৪৬-এ যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ওয়াকাইয়ামা জেলা থেকে নিম্নপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন সংসদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। তখন তাঁর বয়স ২৯। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬—কয়েক দফায় তিনি জাপানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৭ সালে টোকিওতে অবস্থিত এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

কাজুহিরো ওয়াতানাবে

জন্ম ১৯৫২, জাপানের আইচি জেলায়। টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা। রেডিও জাপান এনএইচকে ওয়ার্ল্ডের বাংলা বিভাগের প্রধান। বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক নিয়ে লেখালেখি করেন। হরিপ্রভা তাকেদার *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা* জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন; অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথের গল্প 'দৃষ্টিদান'। তাঁর একাধিক নিবন্ধ ঢাকা ও কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার



আমার বাংলাদেশ
মূল গ্রন্থস্বত্ব © মোতোয়ে হায়াকাওয়া
অনুবাদস্বত্ব © কাজুহিরো ওয়াতানাবে
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৮, আগস্ট ২০১১
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদের নামলিপি : কাইয়ুম চৌধুরী
প্রচ্ছদের তৈলচিত্র : জাপানি শিল্পী এইগো মাসুয়ামা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : এক শ ষাট টাকা

Amar Bangladesh
by Takashi Hayakawa. Translated by Kazuhiro Watanabe
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8110081
e-mail: prothoma@prothomalo.com
Price : Taka One Hundred Sixty Only

ISBN 978 984 8765 78 4

অনুবাদকের উৎসর্গ

মোতোয়ে হায়াকাওয়াকে
স্বামীর মতই বাংলাদেশের প্রতি যাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা

অনুবাদকের কথা

২০০৯-এর শরৎকালের একদিন। একটি জাপানি ওয়েবসাইটের অকশন পেইজে চোখ বোলাচ্ছিলাম। বাংলাদেশের নাম লিখে সার্চ করতেই হঠাৎ তাকাশি হায়াকাওয়ার নাম কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠে। বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে হায়াকাওয়ার নাম অবিস্মরণীয়। তবে এই রাজনীতিবিদ যে বাংলাদেশ নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন তা আমার জানা ছিল না। বইটির নাম দেখে আগ্রহী ক্রেতার তালিকায় আমার নাম লিপিবদ্ধ করলাম।

কয়েক দিন পর বইটি পাওয়া গেল কোনো রকম প্রতিযোগিতা ছাড়াই। সত্তর পৃষ্ঠার পাতলা একটা বই। পড়েই বুঝতে পারলাম, বইটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছরে নতুন এই দেশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক কীভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তার পাশাপাশি সেই সম্পর্ক গড়ার কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এক ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই বইয়ে। অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী মনজুরুল হককে বইটির কথা জানালাম। তিনিও রচনাটি সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হন এবং এটি বাংলায় অনুবাদ করার পরামর্শ দেন। তিনি *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফের সঙ্গে কথা বলে লেখাটি বাংলাদেশে প্রকাশের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

হায়াকাওয়ার স্ত্রী মোতোয়ে হায়াকাওয়া খুশি হয়ে লেখাটি বাংলায় অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন। এই বইয়ে স্বামী সম্পর্কে তাঁর কথাও ধরা থাকল। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এটা আমি তৈরি করেছি। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং মি. হায়াকাওয়ার ছবি জোগাড় করার ব্যাপারে

মিসেস হায়াকাওয়া ও টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. ৎসুইয়োশি নারার সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এ বইয়ের একটি অধ্যায়ের নাম 'বিমান ছিনতাই ঘটনা : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বিশেষ দূত হিসেবে বাংলাদেশ সফর'। ওই বিমান ছিনতাই বিষয়ে কিছু তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই।

তাকাশি হায়াকাওয়ার বইয়ের শেষ দিকটায় ছিনতাই হওয়া একটি জাপানি যাত্রীবাহী বিমানের ঢাকায় অবতরণ এবং সেই সূত্রে ছিনতাইকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চালানো আলোচনার উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে টোকিওগামী জাপান এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী জেট বিমান মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে উড়ে যাওয়ার পর জাপানের সেই সময়ের চরমপন্থী গ্রুপ জাপানি লাল ফৌজের পাঁচজন সদস্য বিমানটি ছিনতাই করেন। ১৪ জন ক্রু ও ১৩৭ জন যাত্রী বিমানে ছিলেন। অস্ত্রধারী ছিনতাইকারীরা ৬০ লাখ ডলার এবং জাপানের কারাগারে আটক নয়জন চরমপন্থীর মুক্তি দাবি করেন।

১ অক্টোবর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা পণবন্দীদের জীবন রক্ষার জন্য জঙ্গিদের দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একই দিনে জাপান সরকারের একটি প্রতিনিধিদলও টোকিও থেকে রওনা হয় ছিনতাইকারীদের সঙ্গে দর-কষাকষির উদ্দেশ্যে। ২ অক্টোবর ভোরে ঢাকায় একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং ১১ জন সেনা কর্মকর্তা এতে প্রাণ হারান। অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা অবশ্য একই দিনে দমন করা হয়। ছিনতাইকারীরা মুক্তিপণ ও আটক চরমপন্থীদের মুক্তির বিনিময়ে জিম্মিদের এক অংশকে ছেড়ে দেন এবং পরদিন ৩ অক্টোবর ৪৭ জন জিম্মিসহ বিমানটি ঢাকা বিমানবন্দর ত্যাগ করে। কুয়েত ও সিরিয়া হয়ে আলজেরিয়ায় পৌঁছানোর পর সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে ছিনতাইকারীরা আত্মসমর্পণ করেন এবং জিম্মিদের সবাইকে মুক্ত করা হয়।

সবার আগ্রহ ও সহযোগিতায় তাকাশি হায়াকাওয়ার রচনার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি।



তাকাশি হায়াকাওয়া

তাকাশি হায়াকাওয়ার জন্ম ১৯১৬ সালের ২১ আগস্ট জাপানের ওয়াকাইয়ামা জেলায়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে পাস করে ১৯৪১ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি শুরু করলেও কিছুদিন পর নৌবাহিনীতে তিনি যোগদান করেন হিসাব বিভাগের একজন কর্মকর্তা হিসেবে। ১৯৪৩ সালে মোতোয়ে হাতানাকার সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে হায়াকাওয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফিরে আসেন এবং মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় চাকরি ছেড়ে দেন। পরের বছর এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে হায়াকাওয়া ওয়াকাইয়ামা জেলা থেকে নিম্নপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। তিনি ছিলেন সংসদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

১৯৬৩ সালে প্রধানমন্ত্রী হাইয়াতো ইকেদা মন্ত্রিসভা গঠন করলে প্রথমবারের মতো তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন পান। ১৯৬৬ সালে শ্রমমন্ত্রী এবং ১৯৭৬ সালে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ১৯৭৭ সাল থেকে টোকিওতে অবস্থিত এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শিক্ষাঙ্গনেও তিনি অবদান রেখেছেন। নিম্নপরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় ১৯৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। তখন তাঁর বয়স ৬৬ বছর।



স্বামীর স্মৃতি

মোতোয়ে হায়াকাওয়া

১৯৭০ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তখন আমার স্বামী টোকিওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ হন। সেটাই ছিল তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের সূত্রপাত। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেন এবং জাপান সরকার যাতে স্বাধীন বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয়, সেই উদ্দেশ্যে অধীর আগ্রহে কাজ করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাপান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রথম বাংলাদেশে যান। এরপর বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও গভীর হয়।

তিনি বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করতেন। জাপানে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ভোটারদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এত বেশি বাংলাদেশের কথা বলতেন যে তাঁর সঙ্গীরা ভোট জোগাড় করার জন্য বাংলাদেশের প্রসঙ্গ ভাষণে কম তুলে ধরার অনুরোধ করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু তিনি বলতেন, 'বাংলাদেশ আমার দ্বিতীয় দেশ, আমি আমার নিজের দেশের কথা বলব না কেন?'

আমি ছ'বার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমার প্রথম বাংলাদেশ সফরের সুযোগ আসে ১৯৭৪ সালে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সে বছর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য স্বামীর সঙ্গে আমাকেও আমন্ত্রণ জানান। এই সফরে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সরাসরি দেখাও করেছিলাম।

শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, তিনি অত্যন্ত উদারমনা মানুষ এবং তিনি এই নতুন দেশকে দাঁড় করাতে পারবেন। তিনি তাঁর বুকের পকেট দেখিয়ে বলেন, 'এখানে সব সময়ই আপনাদের জন্য আমন্ত্রণপত্র থাকে, কাজেই যেকোনো সময়ে বাংলাদেশে বেড়াতে আসতে পারেন।' কথাটা এখনো আমার মনে গেঁথে রয়েছে।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার স্বামী পরলোকগমন করেন। বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর দেহভস্মের এক অংশ জমা রাখার ব্যাপারে তিনি উইল করে গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভের চেষ্টা করি এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সহযোগিতায় ঢাকায় এক বৌদ্ধমঠে তাঁর দেহভস্মের একাংশ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা হয়।

১৯৭৭ সালে আমি বাংলাদেশের সঙ্গে বেসরকারি পর্যায়ে মৈত্রীর বন্ধন জোরদার করার উদ্দেশ্যে টোকিওতে তৎকালীন বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী ও অন্যান্য বন্ধুর সহযোগিতায় জাপান-বাংলাদেশ মহিলা সাংস্কৃতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশি ও জাপানি রান্নার পদ্ধতি, ইকেবানা বা জাপানি কায়দায় ফুলসজ্জার মতো কলাশিল্প এবং নাচসহ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে দুই দেশের মহিলাদের একে অন্যকে জানার সুযোগ হয়। স্বামীর ইচ্ছা টিকিয়ে রাখার জন্য এই কার্যক্রম আমি চালিয়ে যাব।

আমার বয়স এখন ৯০। আরেকবার গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও বয়সের কারণে আর পারব বলে মনে হয় না। তবে বাংলাদেশিদের খুব আপন মনে করি। তারা আমার নিকটাত্মীয়ের মতো।

আমার বাড়ির বসার ঘর স্বামীর রেখে যাওয়া জিনিসে ভরা। ওঁর লেখা বই, বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় তোলা ছবিসহ প্রচুর ছবি, বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা উপহারসামগ্রী—এসব জিনিস মৃত্যুর ২৮ বছর পরও আমাকে স্বামীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ওঁর স্মৃতি গেঁথে আছে আমার মনে। স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত এই ঘর থেকে বাংলাদেশের সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আপনারা সবাই ভালো থাকুন।

স্বাধীন বাংলাদেশ

যোগাযোগের সূত্রপাত

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাস। মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ংকর বলে কথিত এক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। এতে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই খবর শুনে আমি মানবপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে টোকিওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে শরিক হলাম। সংগৃহীত টাকা জাপানে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের কাছে পাঠানো হবে।

প্রায় একই সময় আমি জানতে পারলাম, সেই পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগত মুক্তি-আন্দোলন তখন তুঙ্গে উঠেছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় চলে আসা মুক্তি-আন্দোলনের শেষ পর্যায় এটি। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্যের অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলার ভূমি ও সেখানকার মানুষ সম্বন্ধে আমার জানার আগ্রহ যতই বেড়ে যেতে থাকে, শাসক পশ্চিম পাকিস্তান এবং পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ততই যেন তীব্রতর আকার ধারণ করে।

ভারতকে মাঝখানে রেখে কয়েক হাজার কিলোমিটারের ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান। ধর্ম এক হলেও জাতি, ভাষা ও আচার-আচরণ সবই ভিন্ন। আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল যে এমন দেশ গড়া আদৌ সম্ভব কি না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনের অধীনে বাঙালিদের তাদের নিজের ভাষায় কথা বলারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারা কার্যত ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলেন। এসব

জানতে পেরে আমার মনের মধ্যে বাঙালিদের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমন অভিযানের পর শুরু হওয়া স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বাঙালিরা নিজের দেশ পেতে সক্ষম হয়েছেন। এই পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামের একটি নতুন দেশের জন্ম হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আমি আমার অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই এবং অন্য কয়েকজন সাংসদের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাপান সরকারের প্রতি আহ্বান আমি জানাতে থাকি। সরকারও এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সবার আগেই জাপান নবগঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম সফরে যাওয়ার সুযোগ এল। জাপান সরকার বিশেষ মৈত্রীদূত হিসেবে আমাকে ও আমার সহকর্মী তাকাশি হাসেগাওয়াকে ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাংলাদেশে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন তখনো পুরোপুরি শুকোয়নি, তবে নিজের চোখে বাংলাদেশকে দেখতে পেরে মন আনন্দে ভরে উঠল। বাঙালি জাতির মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি আমার সহানুভূতি এরপর দেশের সীমানা এবং জাতিগত পার্থক্য পেরিয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সংহতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের পর মানবজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংসের ভয়ের সম্মুখীন। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য মানবজাতিকে পরিণত হতে হবে এক পরিবারে। এই চূড়ান্ত আদর্শের বাস্তবায়ন আমাদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং আগ্রহকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে আমি মনে করছি।

বিশেষ মৈত্রীদূত হিসেবে বাংলাদেশ সফর

জাপান স্বাধীন বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েছিল। সিদ্ধান্তটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান কূটনীতির ক্ষেত্রে এই প্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা উদ্যোগ নিল। এ উপলক্ষে আমি জাপানি

সংসদে আমার দুজন সহকর্মী তারো সুগা ও তাকাশি কাসাওকার সঙ্গে বিশেষ মৈত্রীদূত হিসেবে বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ পাই।

১৯৭২ সালের ১২ মার্চ দুপুরে টৌকিওর হানেদা বিমানবন্দর থেকে আমরা রওনা হলাম। এক রাত কলকাতায় থেকে পরদিন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের দুই প্রপেলারবিশিষ্ট বিমানে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বিমানের জানালা দিয়ে বাংলাদেশের প্রশস্ত ভূমি দেখতে পেলাম। বিশাল এই প্রান্তের ওপর জালের মতো বিস্তৃত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও অন্য অসংখ্য নদী ও শাখানদীর স্রোত। এই বৃহদাকার বদ্বীপের আয়তন জাপানের হোক্কাইদো দ্বীপের প্রায় দ্বিগুণ। এখানে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম আট কোটি লোকের বাস। যথেষ্ট পরিমাণে পাট ও চা উৎপন্ন হয় এই ভূমিতে।

জাপানের কিছু লোকের মতে, বাংলাদেশের জনগণ আসলে স্বাধীনতা চাননি। যাওয়ার আগে কথাটা শুনে আমরা কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমাদের সেই দুশ্চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে দূর হলো। পুরো ঢাকা শহর যেন স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের আনন্দে ভরে উঠেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত সবাইকে দেখেছি স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দে আত্মহারা হতে। আমরা নরসিংদীর ঘোড়াশালে জাপানের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তান আমলে নির্মিত সার কারখানা পরিদর্শন করতে যাই, শত শত শ্রমিক 'জয় বাংলা'র উল্লসিত ধ্বনির মাধ্যমে আমাদের স্বাগত জানান। একটি বড় পাটের কারখানাতেও গিয়েছিলাম। সেখানে এক হাজার ২০০ জন কর্মী একই উপায়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের খুশি করেন। দুই হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা পশ্চিম পাকিস্তানের আলাদা জাতির শাসকদের শাসনের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন এত দিন রাজনীতি, সামরিক ও অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নিপীড়িত এবং শোষিত হয়ে যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন, সে কথা ভাবলে স্বাধীনতার জন্য বাঙালির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা সহজেই বোঝা যায়।

এখানে যুদ্ধের গভীর ক্ষতচিহ্ন এখনো চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশের জনসংখ্যা আট কোটি। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তাদের মধ্যে ৩০ লাখ মানুষকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। এক কোটি লোক পরিণত হন শরণার্থীতে। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে জানান, প্রায় তিন কোটি লোক এখনো গৃহহীন অবস্থায়। তাঁদের টাকাপয়সা নেই, খাবারও জোটে না। সব সেতু ভেঙে ফেলা হয়েছে।

যানবাহন ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম ও ভারতের কলকাতা বন্দরে বিভিন্ন দেশ থেকে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছালেও সেগুলো ভুক্তভোগীদের হাতে আসছে না। জাতিসংঘের ঢাকাস্থ প্রতিনিধির ভাষ্য অনুযায়ী, চালের দাম দিনের পর দিন যে হারে বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে লাখ লাখ লোককে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে। আফ্রিকার বায়াফ্রার দুঃখজনক ঘটনার এখানে পুনরাবৃত্তি হবে বলে তিনি আশঙ্কা করছিলেন। ঢাকায় ধ্বংসলীলার চিহ্ন তেমন চোখে না পড়লেও ঢাকা থেকে জাহাজে করে ঘোড়াশাল যাওয়ার পথে নদীর দুই ধারে পুড়ে যাওয়া গ্রাম দেখে মনে কষ্ট পেলাম। বাংলাদেশকে দ্রুত সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। কারণ স্বাধীনতার আনন্দে বাংলাদেশের জনগণ চিরকালের জন্য ক্ষুধা সহ্য করতে পারবে না।

১৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে জাপানি প্রধানমন্ত্রী এইসাকু সাতোর চিঠি দিতে হবে। সন্ধ্যা সাতটার পর প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনে পৌঁছে আমাদের অবাক হতে হলো। প্রচুর লোকের ভিড়। তাঁরা নাকি নানা অনুরোধ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসেছেন। এমন দৃশ্য জাপানে কখনো দেখা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি মুখভরা হাসি নিয়ে আমাদের স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অর্ধেক জীবন কেটেছে জেলবন্দী হয়ে। তবে তিনি যে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করে এসেছেন, তাঁর প্রাণবন্ত চেহারা ও আন্তরিক মনোভাব দেখে সে কথা বোঝার উপায় নেই। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের দিন প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী কেবল জাতির মুক্তি-আন্দোলনের নেতা নন, তিনি এ দেশের প্রতীকও। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে প্রেসিডেন্টের কথাটার মানে ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। দেশের জনগণের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর স্বার্থহীন ভালোবাসার সুন্দর প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর এমন এক ভাষণে, যেখানে তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা হারালে সঙ্গে সঙ্গে আমি অবসর নিতে প্রস্তুত থাকব। তবে আপনাদের সকলের মুখে যেদিন হাসি ফুটবে, সেই দিন পর্যন্ত আমি আমার প্রাণ দেশের জন্য উৎসর্গ করতে চাই।'

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বৈঠকে প্রথমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি তাঁর গৃহীত জোটনিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র নীতির ওপর জোর দেন এবং সেটি টিকিয়ে রাখার জন্য একই এশিয়ার মিত্র দেশ হিসেবে জাপানের সহযোগিতা কামনা করেন।

দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে তিনি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতির সমন্বয়ে নিজস্ব নীতি অনুসরণ করে যাওয়ার কথা বলেন। আমি যখন কিছুটা সংকোচের সঙ্গে স্বাধীনতার পর চরমপন্থী কমিউনিস্টদের উত্থান সম্পর্কে জানতে চাইলাম, তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'সেই ধরনের চরমপন্থীদের সামান্য তৎপরতা জাপানেও দেখতে পাওয়া যায়, তাই না?' এই কথার মাঝে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি করতে পারলাম।

এই বৈঠকে আমি তাঁকে জাপান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে জাপানি প্রধানমন্ত্রী এইসাকু সাতোর চিঠি হস্তান্তর করি। শেখ মুজিবুর রহমান সেই আমন্ত্রণের জন্য, সেই সঙ্গে জাপান থেকে ১০ লাখ ডলারের সমপরিমাণের সার সরবরাহ এবং ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুনরায় কারিগরি সাহায্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশের কঠিন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফেরি জাহাজ, কোস্টার, ছোট আকারের পরিবহন জাহাজ, ট্রাক, মাছ ধরার জাহাজ এবং টেলিযোগাযোগের সরঞ্জামসহ জরুরি সাহায্য প্রদানের জন্য জোর আবেদন জানিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর পরে খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ায় বাংলাদেশ জাপানকে দুই লাখ টন চালের জরুরি সাহায্যের অনুরোধ করেছিল।

যা হোক, এ দিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সাহায্যের একাংশ হিসেবে যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের অনুরোধ করেন এবং সেই অনুরোধ প্রধানমন্ত্রী সাতোকে জানাতে বলেন। চীনের ইয়াংজি নদীর সমান বড় এই নদীর ওপর জাপানের সাহায্যে সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেতুটি জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধনের প্রতীক হিসেবে চিরকাল মানুষের মনে থাকবে। এই সেতু নির্মাণ আওয়ামী লীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেন, সেতুর নামকরণ করা হবে পিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ অর্থাৎ শান্তি ও মৈত্রী সেতু। জাপানিরা দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলকে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি হিসেবে শ্রদ্ধা করে এসেছে।

সেখানে জাপানের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাহায্যে বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু নির্মাণ বাস্তবায়িত হলে কতই না ভালো হবে।

এ ছাড়া বৈঠকে আমি প্রাকৃতিক গ্যাসের বিষয়টিও তুলে ধরি। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে খ্যাত। কিন্তু এ দেশের মাটির নিচে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের প্রাকৃতিক গ্যাস যে সুপ্ত আছে, সে কথা জাপানের কম লোকই জানে। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বার্ষিক ৩০ লাখ লিটারের তরলকৃত গ্যাস জাপানে রপ্তানি করতে বাংলাদেশ তৈরি আছে কি না। তিনি অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিয়ে বলেন যে গ্যাস কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে ব্যাপারে এখনো কোনো মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বৈঠক নির্ধারিত সময়ের অনেক বেশি অর্থাৎ এক ঘণ্টা ধরে চলেছিল। আমরা যখন তাঁর সরকারি ভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তখনো প্রচুর লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এবার বাংলাদেশে চার দিন থাকাকালে মন্ত্রিসভার সব সদস্য আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রতিদিন আমাদের ছবি ছাপা হতো। এসব ঘটনা থেকে জাপানের প্রতি বাংলাদেশের আন্তরিকতা ও আশা যে কত বড় তা সহজেই অনুমান করা যায়। জাপানের অন্যতম প্রধান দৈনিক *মাইনিচি শিম্বুন*-এর ব্যাংকক অফিসের প্রধান নাগামোতো আমাদের সফরকালে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে জাপানপ্রিয়। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

জাপান বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি (১৯৭২ সালে) এবং এশিয়া অঞ্চলে সবচেয়ে উন্নত দেশ। সেই জাপান বাংলাদেশকে কীভাবে এবং কী রকম সহযোগিতা দেবে, প্রতিবেশী দেশগুলো তা গভীরভাবে লক্ষ করছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান কূটনীতির ক্ষেত্রে মহাদেশসুলভ মনোভাব না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই জাপানকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মানবতার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়তে হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে গভীর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়েছে। সেই তুলনায় জাপানের সাহায্য অতি সামান্য এবং মাত্র কিছুদিন আগেই তা শুরু হয়েছে। আমরা এবার যে ১০ লাখ ডলারের অনুদান

সাহায্য এবং সার কারখানা পুনরায় চালু করার জন্য কারিগরি সাহায্য সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, জাপান রেডক্রসের দেওয়া চার লাখ ডলারের সাহায্যের পাশাপাশি সেগুলো ছিল জাপানের প্রথম সাহায্য প্রদান। একদিন ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘের ত্রাণকেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার প্রধানের অভিযোগ শুনতে হলো আমাকে। তিনি ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের মাধ্যমে দুই কোটি ১০ লাখ ডলারের সাহায্য দিয়েছে (তারপর ২৪ মার্চ আরও সাড়ে তিন কোটি ডলার প্রদান করল যুক্তরাষ্ট্র), এমনকি সুইডেনের মতো ক্ষুদ্র দেশ ৪৭ লাখ ডলারের সাহায্য দিয়েছে, যদিও জাপান ত্রাণকেন্দ্রের জন্য এখনো কোনো সাহায্য দেয়নি।' কথাটা শুনে আমার বড় দুঃখ হলো।

একই এশীয়বাসীর দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করতে হবে জাপানকে। এর মধ্যে দিয়েই আমরা আরও বড় হতে পারব এবং এশিয়ায় আসল বন্ধু পেতে সক্ষম হব। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর দেশ গড়ার প্রক্রিয়ায় কীভাবে সহযোগিতা করে যাবে, মানবতার ভিত্তিতে এশীয় নীতি পরিচালনায় সংকল্পবদ্ধ জাপানের জন্য সেটাই হবে অগ্নিপরীক্ষা। ভারত উপমহাদেশ এখন ব্যাপক পরিবর্তনের পথে রয়েছে। আমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় যে সোনার বাংলার কথা বলা হয়েছে, তার মতো ক্ষুধাবিহীন এবং বেকারত্বের সমস্যামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য জাপানকে কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশের মতো জাপানেরও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। জাপানের বাংলাদেশকে সব ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

১০ এপ্রিল ১৯৭২

আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান

দুই বছর পর আবার বাংলাদেশে

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে থেকে ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়ে প্রায় দুই বছর পর বাংলাদেশে পাড়ি জমানোর সৌভাগ্য হলো। এবার আমার সফরসঙ্গী ছিলেন স্ত্রী মোতোয়ে এবং বন্ধুবর কিইয়োশি মোরি ও তেৎসুরো উদা। দুই বন্ধুই জাপানি সংসদের নিম্নপরিষদের সদস্য। ১৩ ডিসেম্বর টোকিও থেকে রওনা হয়ে সেই রাত ব্যাংককে থেকে পরের দিন অর্থাৎ ১৪ তারিখ সকাল ১০টার বিমানে চেপে ঢাকামুখো হলাম।

ব্যাংকক ছাড়ার কিছুক্ষণ পর বিমানের জানালা দিয়ে বার্মার বিস্তৃত সমতল ভূমি দেখতে পাই। ফসল কাটার মৌসুম শেষ। তাই সব এলাকা সবুজের পরিবর্তে ধূসর রঙে আচ্ছাদিত, যার মাঝখান দিয়ে ইরাবতী নদী ধমনির মতো প্রবাহিত হচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পর জঙ্গলে ভরা আরাকান পর্বতমালা চোখে পড়তে শুরু করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে ইম্ফল অভিযানের সময় এখানে প্রচুর জাপানি সৈন্যকে প্রাণ হারাতে হয়। তাদের কথা স্মরণ করতে করতে একমনে সবুজ এক পাহাড় দেখছিলাম। ৪০ মিনিট কাটতে না-কাটতেই আমার অতি প্রিয় বাংলার ভূমি দেখতে পেলাম। রবীন্দ্রনাথের সেই সোনার বাংলাকে আকাশ থেকে দেখলাম।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—'

আকাশ থেকে দেখলে বোঝা যায়, বার্মার ধূসর রঙের ভূমি থেকে বাংলাদেশের রং আলাদা। এখানে সবুজে ঘেরা ধানখেত চোখে পড়ে, যেটা দেখতে গলফ খেলার মাঠের মতো। আমাদের বিমান উত্তরের দিকে মুখ করে উড়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকে শান্ত বঙ্গোপসাগরের বিস্তার। একসময় হাতিয়া ও ভোলা দ্বীপ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে এই দুই দ্বীপ প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসে তিন লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে। তবে এখন সেই দুঃখজনক ঘটনার চিহ্ন নেই। আকাশ থেকে দেখলে দ্বীপ দুটিকে অত্যন্ত শান্ত ও নিরিবিলি মনে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এই দৃশ্য আবারও বদলে যায়। আমাদের বিমান বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপের ওপর এসেছে পৌঁছেছে। হিমালয় থেকে আসা গঙ্গা ও তিব্বত পর্বত অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী ব্রহ্মপুত্র বিশ্ববিখ্যাত দুটি বড় নদী। তারা এখানে এসে একাকার হয়ে যায় এবং তারপর বঙ্গোপসাগরে গিয়ে তাদের দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি ঘটে। এখন শুকনো মৌসুম সত্ত্বেও দুটি নদীর মূল স্রোত এবং তাদের অজস্র শাখাস্রোত পানিতে পরিপূর্ণ। ভূমির ওপর নদীগুলোর বিচিত্র অঙ্কন। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম।

এই ভূমিতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে জাপানবান্ধব আট কোটি মানুষের বাস। এখানে জাপানের মতো প্রচুর বৃষ্টি হয়। এখানকার লোক আমাদের মতো ভাত খান প্রধান খাদ্য হিসেবে। আমাদের মতো তাঁরাও আবেগপূর্ণ। স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০ লাখ স্বদেশবাসীকে হারাতে হয়েছে তাঁদের। তাঁদের স্বাধীনতাসংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে ঢাকা যাচ্ছি ভেবে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। ব্যাংকক ছাড়ার আড়াই ঘণ্টার মাথায় ঢাকা শহর দেখতে পেলাম।

যেন নায়ককে স্বাগত জানানো হচ্ছে

স্বাধীনতাযুদ্ধের পরপরই দুজন সাংসদ, হাসেগাওয়া (যিনি বর্তমানে শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন) ও কাসাওকার সঙ্গে জাপান সরকারের বিশেষ

দূত হিসেবে বাংলাদেশে যাওয়ার পর গত দুই বছর আমি বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি। মানবপ্রেমই আমার প্রচেষ্টার ভিত্তি। আমার সেই মনোভাবের প্রতিদান হিসেবে বাংলাদেশিরা সম্ভবত আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—এ কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল।

বিমানটি সময়মতো ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানের নিচে প্রচুর লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ, চিফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা, বাংলাদেশ-জাপান সমিতির উপপ্রধান ড. চৌধুরী, ঢাকায় জাপানি রাষ্ট্রদূত তাকাশি ওইয়ামাদা এবং এখানে প্রবাসী জাপানিদের মুখও দেখতে পেলাম। তাঁদের সংখ্যা এক হাজারের কম হবে না। বিজয় অর্জন করে রণক্ষেত্র থেকে স্বদেশে ফিরে আসা সেনানায়ককে স্বাগত জানানোর মতো আগ্রহভরা অভ্যর্থনা! বিমানবন্দরের প্রধান ভবনের ভেতরে বাংলাদেশ-জাপান সমিতির সদস্যরা বড় ব্যানার নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিলেন। বহু মহিলা সদস্যও এসেছেন। তাঁরা প্রচুর ফুলের তোড়া ও পাট দিয়ে তৈরি মালা দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। দুই বছর আগে যখন আসি, তখন মাত্র ১০ জন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে। দুই বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন ঘটবে, ভাবতেও পারিনি। আর এই পরিবর্তনের তাৎপর্য ভেবে মুগ্ধ হলাম।

বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার উদ্দেশে রওনা হলাম। রাস্তার দুই পাশের দৃশ্যে তেমন পরিবর্তন হয়নি বিগত দুই বছরে। কিন্তু সম্ভবত বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসার কারণে গাছপালার সবুজ ও সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর অবয়ব অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন লাগল। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে এখানো শরণার্থী শিবির থেকে যাওয়া এবং ট্রেনের ছাদে আগের মতো প্রচুর আরোহীকে চড়তে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য সংসদ ভবন নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে এবং রাস্তায় সাইকেল-রিকশার ভিড়ের মধ্য দিয়ে জাপান থেকে পাঠানো নতুন বাসগুলো ছুটে যেতে দেখেছি। দুই বছর আগে শুধু পুরোনো বাসগুলো চোখে পড়ত। তখন ঢাকার জনসংখ্যা ছিল আট লাখ। আজ বেড়ে ২০ লাখ হয়েছে। শহরটি একেবারে প্রাণবন্ত এবং নাগরিকদের মুখে

উজ্জ্বলতা। মনে হলো, গোটা দেশ স্বাধীনতা থেকে প্রেরণা পেয়ে দৃঢ়ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর অপ্রত্যাশিত আগমন

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবনটি এক কথায় চমৎকার—মর্মর পাথরের মেঝে এবং বিশাল উদ্যান চমক লাগানোর মতো। আগে এটি নাকি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পাট-শিল্পপতি জি এম আদমজির বাসভবন আর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এটিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে অতিথি ভবন হিসেবে ব্যবহার করছে।

কোনো সময় নষ্ট না করে আমাদের কর্মসূচি শুরু হলো। সবকিছুর আগেই আমাদের সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল। তখন একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পদ্মায় এসে হাজির হয়েছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন, শিল্পমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান প্রমুখ সরকারি নেতা। প্রধানমন্ত্রী আমার হাত ধরে বলেছেন, 'আপনি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং গোটা বাংলাদেশের বন্ধু। তাই আমি নিজে দেখা করতে এসেছি আপনাকে সম্মান দেখানোর জন্য। সেখানে কূটনৈতিক রীতিনীতি বা প্রথা কিছু যায় আসে না।' কথাটা বলতে বলতে তিনি আমার হাত চেপে ধরে ছাড়তে চাননি। এত মনোমুগ্ধকর মুহূর্ত জীবনে কতবার মেলে? কোনো প্রধানমন্ত্রী যে একজন সাধারণ সাংসদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, সেটা কূটনৈতিক প্রথাবহির্ভূত বলে এই সাক্ষাৎকারের সময় সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু কী করে যেন সাংবাদিকেরা খবরটি জানতে পেরেছেন এবং বন্ধুত্বের সাক্ষাতের শিরোনামে খবরের কাগজে ফলাও করে লেখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে আমাদের জন্য পদ্মায় যে মধ্যাহ্নভোজসভার আয়োজন করা হলো, তাও অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সবাই এখানে আছেন দেখে আমি ঠাট্টা করে প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, এটি হুবহু মন্ত্রিসভার বৈঠকের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'হায়াকাওয়া, আপনি বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা!' তাঁর এই ঠাট্টা শুনে সবাই হাসতে লাগলেন। আবার তিনি বাংলাদেশে আমার সফরসূচি দেখে জনাব তোফায়েলকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এত ব্যস্ত হলে এদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, সফরসূচিটা বদলাতে হবে। কথাটা শুনে আমি বললাম, নির্বাচনী অভিযানের সঙ্গে তুলনা করলে এটা কিছুই নয়। আমার বক্তব্য শুনে সবাই আবার হেসে উঠলেন। ভোজসভার শেষে সবার টেবিলে মিষ্টান্ন দেওয়া হলো। আমার পাশে বাণিজ্যমন্ত্রী কামরুজ্জামান বসে ছিলেন। তিনি গাছের পাতায় মোড়া জিনিস খাচ্ছেন দেখে কৌতূহল হলো। এটাকে নাকি পান বলে। তাঁর কাছ থেকে একটা চেয়ে নিয়ে মুখে দিলাম। ভীষণ তেতো! আমার বিকৃত মুখ দেখে প্রধানমন্ত্রী একজন বয়কে ডেকে একটি প্লেট আনিয়ে সেখানে মুখের ভেতরের জিনিস ফেলে দিতে বললেন। তিনি আমার কথা এত ভাবছেন দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু আমার পক্ষে ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ আমি ততক্ষণে পান গিলে ফেলেছি। সে কথা জানাতেই উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। পারিবারিক সমাবেশের মতো অথবা তার চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে সভাটি শেষ হলো।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং এই ভোজসভার মাধ্যমে তাঁকে আরও ভালো করে জানার সুযোগ হলো। তিনি তাঁর জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে দেখে তাঁর মনের তেজ ও শক্তি কেউ কখনো জানতে পারবে না। তিনি সদা হাসিখুশি ও উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী। যে কেউ তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আবার জাপানে যেতে চাই

মধ্যাহ্নভোজসভার পর ওই দিন বিকেল তিনটা থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি শুরু হলো। আমাদের ব্যস্ততা দেখে প্রধানমন্ত্রী সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে জাপানি দূতাবাসের অভ্যর্থনা

সভা। প্রবাসী জাপানিসহ প্রায় ৫০ জন এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪০ ভাগ মহিলা দেখে বেশ অবাক হলাম। ঢাকায় জাপান সমিতির প্রধান ও মিৎসুই করপোরেশনের ঢাকা অফিসের প্রধান মি. হান্দা আমার পুরোনো বন্ধু। তিনি তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের সময়কার কথা স্মরণ করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যখন জাপানের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান এবং জাপান থেকে দেশে ফিরে আসেন, জাপান সমিতির পক্ষ থেকে আমরা তখন বিমানবন্দরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। এখান থেকে যাওয়ার সময় তাঁর মুখে উত্তেজনার ছাপ দেখা গেলেও যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর মুখ ভরে ছিল হাসি। বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তিনিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাপান গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, জাপানে তাঁদের যেভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে, তাতে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ। মি. হায়াকাওয়া যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই কিই-কাৎসুউরা শহরের নাগরিকেরা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের গাড়িবহরকে বাংলাদেশের পতাকা নাড়াতে নাড়াতে জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে গ্রহণ করেন, অথবা টোকিওর হোটেলে তাঁদের জন্য যে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল, সেই দৃশ্য এখনো স্বপ্নের মতো তাঁর চোখের সামনে ভাসছে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এরপর আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, এবারের সফরে কী জিনিস সবচেয়ে ভালো লাগল, বলতে পারেন? সেখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট বাংলাদেশি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউই উত্তর দিতে পারলাম না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, সঠিক উত্তর হলো, জাপানের জনগণ এবং তাঁদের আন্তরিকতা। কথাটা আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। কোনো একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ থেকে নিজের দেশ নিয়ে এত প্রশংসা কে আশা করতে পারে? পরে সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর ও ব্যাংককে গিয়ে সেখানে প্রবাসী জাপানিদের এই অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। কথাটা শুনে সবাই একস্বরে বলে উঠলেন, হায়, আমরা যেখানে থাকি, সে দেশের সঙ্গে জাপানের ওই রকম সম্পর্ক হলে কতই না ভালো হতো! রাষ্ট্রদূত ওইয়ামাদার কাছে শুনলাম, প্রধানমন্ত্রীর ছোট ছেলে শেখ রাসেল নাকি বলেছে, সে আবার জাপানে যেতে চায়, অন্য কোনো দেশ নয়, জাপানে। প্রধানমন্ত্রীর মতামত জানতে

না পারলেও তিনিও সম্ভবত একই কথা বলবেন। যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের পর বাংলাদেশিদের মধ্যে জাপানের ভাবমূর্তির আরও উন্নতি হয়েছে। এখন বাংলাদেশে একধরনের জাপান-হিড়িক পড়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।'

আমরা জাপানে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সফরসঙ্গীদের আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করেছিলাম। দেশ আলাদা হলেও মানুষের মনে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের মন তাঁরাও বুঝতে পেরেছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা এটি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে জাপানপ্রিয় দেশের একটি। এর আগে জাপান এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে যেভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে এসেছিল, সেটি ছিল অনেক বেশি অর্থকেন্দ্রিক আর তাতে মনের সঙ্গে মনের যোগাযোগ ও মানবিকতার অভাব রয়ে গিয়েছিল।

যমুনা সেতু : শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক

বিকেল সাড়ে চারটায় প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার। আগে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিদ্যাদীপ্ত মানুষের যা হয়, ঠিক সে রকম শান্ত ও বিনয়ী স্বভাবের মানুষ। আমাদের এত বিনীতভাবে গ্রহণ করলেন যে আমাদের বরং অস্বস্তি লাগছিল।

মুখ খুলে প্রথমে তিনি বাংলাদেশের প্রতি জাপানের সাহায্য এবং আমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বিজয় দিবস উপলক্ষে জাপানি সম্রাটের পাঠানো বার্তায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এর আগে জাপানি রাজকুমারের সঙ্গে একবার দেখা করার সুযোগ হয়েছিল প্রেসিডেন্ট চৌধুরীর। চা খেতে খেতে তিনি সেই স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং রাজকুমারের চমৎকার চরিত্রের প্রশংসা করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে কাজ করতেন এবং তৎকালীন জাপানি রাষ্ট্রদূত সেঞ্জিন ৎসুরুওকার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন বলে জানালেন। এ ছাড়া তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিষয় তুলে ধরে তাঁর সঙ্গে জাপানি কবি ইয়োনেজিরো নোগুচির সম্পর্ক সম্বন্ধে

বিস্তারিত আলোচনা করে আমাদের বিস্মিত করেন। তাঁর কথা শুনে বুঝতে বাকি রইল না, জাপান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান কত গভীর।

তারপর সাড়ে পাঁচটায় যোগাযোগমন্ত্রী মনসুর আলীর সঙ্গে বৈঠকে যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলাম। বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্তকারী এই নদীর প্রস্থ আট কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বলে এতে পারাপারকারী সেতু নির্মাণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। দুই বছর আগে জাপান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে যখন বাংলাদেশে যাই, তখন প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই এই সেতুর কথা তুলে ধরেছিলেন। গতবারের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির তালিকার প্রথমে সেতুটির কথা উল্লেখ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এই সেতু নির্মাণে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন যে তিনি তাঁর নামকরণ করেছেন শান্তি ও জাপানের সঙ্গে মৈত্রী সেতু বলে।

বাংলাদেশ থেকে জাপানে ফেরার পর এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথা বলে জাতীয় বাজেটে সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে জরিপ চালানো এবং নকশা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বরাদ্দ করিয়ে নিয়েছিলাম। এত দিনে জাপান থেকে বিশেষজ্ঞ গিয়ে জরিপের কাজ শুরু করেছেন। এই সেতু নির্মাণের জন্য আরও পাঁচ-ছয় বছর লাগবে। তবে জাপানের সাহায্যে রেলওয়ে এবং মোটরগাড়ি চলাচলের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সেতু তৈরি হলে সেটি জাপান ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে চিরদিন লোকের মনে থাকবে।

সন্ধে সাড়ে সাতটায় দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁর বয়স সবে ৪০ পার হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই তরুণ রাজনীতিবিদ ভবিষ্যতে শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকারী হবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একবার জাপান সফরে গিয়েছিলেন। আমার বন্ধু মানুষ। আমাদের এবারের বাংলাদেশ সফরের সব দেখাশোনা করছেন তিনি। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা সব সময় আমাদের কাছে থেকেছেন, যাতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। তা ছাড়া তিনি আমাদের দোভাষী হিসেবে টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত এস এ জালালকে ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সাহায্যে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

রাত সাড়ে আটটা থেকে যোগাযোগমন্ত্রীর উদ্যোগে আমাদের স্বাগত জানিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে নৈশভোজসভা শুরু হয়। এতে কৃষিমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন, বিচারমন্ত্রী ও জাপানে নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত মনোরঞ্জন ধরসহ বিভিন্ন মহলের প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। এই সভায় আমাকে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছিল।

আপনাদের সাফল্য কামনা করি

বক্তব্যে আমি এইভাবে বললাম, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই উষ্ণ আপ্যায়নের জন্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে এবার দুই বছর পর এবং দ্বিতীয়বারের মতো আপনাদের দেশে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বিগত দুই বছর আমি রোজ বাংলাদেশের কথা ভেবেছি এবং সপ্তাহে অন্তত কয়েক দিন বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করেছি। অর্থাৎ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে মনের দিক থেকে আমি প্রতিদিন বাংলাদেশে এসেছি (হাততালি)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে জাপান ধনী দেশে পরিণত হলেও বাংলাদেশে বেকার ও দুর্ভিক্ষের সমস্যা যত দিন থাকবে, তত দিন আমি কখনো সুখী হতে পারব না।

আপনারা জানেন, আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। প্রথমত, আমাদের জাতীয় পতাকার নকশা একই রকম। দ্বিতীয়ত, আমরা একই এশিয়াবাসী এবং আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। বাংলাদেশে এসে আমি অবাক হচ্ছি, কারণ আমার সঙ্গে চেহারায় মিল থাকা বহু মানুষকে এখানে দেখতে পাচ্ছি। তৃতীয়ত, আমরা গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা জাপানে ব্যাপক পঠিত। আমি নিজেই ছাত্রজীবনে তাঁর 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাটা পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। এ ছাড়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম জাপানে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং জাপানিরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত টোকিও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক হিসেবে যিনি জাপানকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছিলেন, সেই ড. রাধাবিনোদ পালকে জাপানিরা ভালোবাসেন।

বলাই বাহুল্য, তাঁরা দুজনও বাঙালি। চতুর্থত, আমাদের দুই দেশই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আপনাদের মতো আমাদের দেশেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের ৩০ লাখ মানুষ নিহত এবং এক কোটি লোক গৃহহারা হয়েছিলেন।

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে এত মিল থাকা সত্ত্বেও একটা বড় অমিল রয়েছে। সেটি হলো এই বাস্তবতা যে জাপান যুদ্ধে পরাজিত হলেও আপনারা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। যুদ্ধে পরাজিত হলেও জাপান ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধে বিজয় লাভকারী আপনারা বাংলাদেশিরা অচিরেই দেশের পুনর্গঠনে সফল হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি (হাততালি)।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। এ দেশে ধর্মনিষ্ঠ আট কোটি লোক আছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনশক্তির অধিকারী দেশ। এখানে রয়েছে সমৃদ্ধ সূর্যকিরণ এবং ব্যাপক সমভূমি। বিশ্বের অনেক দেশ পানির অভাবে হিমশিম খেলেও এখানে কখনো পানির অভাব নেই। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাট উৎপাদনকারী দেশ। এখানে ধান, চা ও ফলমূলের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম সামুদ্রিক ও মিঠাপানির সম্পদও রয়েছে। জ্বালানির উৎস হিসেবে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগরে তেল পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এত সুবিধার পরও আপনাদের আরও একটি সৌভাগ্য রয়েছে এবং সে কথা ভেবে আমি ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারি না; সেটি হলো, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আপনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। হয়তো কিছু সমস্যা থাকবে এবং কিছুদিন আপনাদের কষ্ট পেতে হবে। তবু আপনারা সেগুলো কাটিয়ে উঠবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

এবারের সফরের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনাদের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি (ব্যাপক হাততালি)।

আমার এই ভাষণ উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেছে বলে মনে হয়। পরের দিন এক প্রধান দৈনিকে এই রকম সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল: 'এত দিনে

বেশ কয়েকবার বিদেশি রাষ্ট্রদূতের ভাষণ শোনার সুযোগ হলেও মি. হায়াকাওয়ার মতো অকৃত্রিম ভালোবাসা ও খাঁটি উৎসাহে পরিপূর্ণ বক্তব্য এর আগে কখনো শুনতে পারিনি। এখন যত সামান্যই হোক না কেন, এমনকি ১০০ ডলারের নগদ অর্থ অথবা মাত্র এক টন চালও আমাদের চাই। কিন্তু মি. হায়াকাওয়া যেমনটি উল্লেখ করলেন, এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ী দেশ হিসেবে আত্মসম্মান এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য জোরালো ইচ্ছা।'

সম্পাদকীয়টি পড়ে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও খুশি হলাম।

সিরাজগঞ্জে গাছ রোপণ অনুষ্ঠান

১৫ ডিসেম্বর। সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠে বিশাল বাগানে বেরিয়ে শিশিরে ভেজা লনের ওপর পায়চারি করলাম। আকাশের মেঘ গোলাপি রঙে রঞ্জিত করে চলে আসা সূর্যের কিরণ গাছের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে এসে মাটিতে পড়ছে। কাকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এমন আনন্দময় স্নিগ্ধ সকাল পাওয়া যায় কেবল বাংলাদেশের মতো দক্ষিণা দেশে। এখন থেকে ৩০ বছর আগে দক্ষিণ চীনের হাইনান দ্বীপে দেখা সূর্যোদয়ের দৃশ্য মনে পড়ল। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলা টোকিও শহরে প্রকৃতির এমন রোমাঞ্চকর এবং আনন্দময় অনুভূতি কখনো পাওয়া যায় না।

সকাল আটটায় জনাব আবদুর রউফ ও জনাব আলম আমাকে নিতে এসেছেন। জনাব আবদুর রউফ একজন সাংসদ ও জনাব আলম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এশিয়া ব্যুরোর প্রধান। আমি বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁরা আমার দেখভাল করছেন।

আজ সিরাজগঞ্জে যাব। বিমানবন্দর থেকে সোভিয়েত নির্মিত হেলিকপ্টারযোগে রওনা হলাম। সেতু নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে যে কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিরাজগঞ্জ তার মধ্যে একটি। হেলিকপ্টার থেকে যমুনা নদীর প্রশস্ত স্রোত দেখতে পেলাম। শুকনো মৌসুম হলেও সুদূর তিব্বত থেকে

বয়ে আসা এই মহান নদীটি পানিতে পরিপূর্ণ। নদীটি অজগরের মতো বাংলার সমতল ভূমির ওপর দিয়ে চলে যায় বৃহৎকায় বঙ্গোপসাগরের দিকে। যমুনা নদীর প্রস্থ ৮-১০ কিলোমিটার। বলা হয়, ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটেনের উপনিবেশে সূর্যাস্ত হতো না। কিন্তু সেই ব্রিটেনের পক্ষেও যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়নি। সেই দূরস্বপ্ন জাপানের হাতে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে ভেবে বুক আনন্দে ফুলে উঠল।

এক ঘণ্টার ফ্লাইটের পর সিরাজগঞ্জে পৌঁছলাম। হেলিকপ্টার থেকে নেমে দেখি প্রচুর লোক, ১০ হাজারেরও বেশি হবে, সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমাকে স্বাগত জানিয়ে এখানে-সেখানে পতাকা টানানো হয়েছে, স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রের বাজনার শব্দ কানে আসছে। সিরাজগঞ্জ থেকে নির্বাচিত একজন সাংসদ আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর পেছনে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়ানো লোকদের উদ্দেশ করে হাত নাড়াতে নাড়াতে হেঁটে চলেছি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দিকে ফুলের পাপড়ি ছুড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ওদের এত মিষ্টি লাগল যে হঠাৎ তাদের এজনকে তুলে কোলে নিলাম। তাতে উপস্থিত সবাই আনন্দে হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠে। জাপানে বহুদিন রাজনীতিবিদ হিসেবে কাজ করছি। কিন্তু এত আবেগপূর্ণ অভ্যর্থনা কখনো পাইনি।

এক জায়গায় মাটি দিয়ে উঁচু করে রাখা হয়েছে। সেখানে স্থানীয় একজন প্রবীণ নেতা আমাকে নিয়ে গেলেন গাছ রোপণ অনুষ্ঠানের জন্য। গাছের কাছে ইতিমধ্যে এক ফলক স্থাপিত হয়েছে আর তাতে লেখা আছে 'হায়াকাওয়া ট্রি'।

অনুষ্ঠান শেষে সেখান থেকে গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাংলাদেশের বৃহত্তম পাট কারখানায়। পথের মধ্যে স্থল বাহিনীর শিবির পরিদর্শন করলাম। পাটের কারখানায় প্রায় এক হাজার শ্রমিক হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন। ফুল ও পাটে তৈরি মালা দিয়ে আমাদের সাজানো হলো। এত বেশি মালা গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে চোখ বন্ধ হয়ে কিছু দেখতে পাইনি। মনে হলো যেন নিজের নির্বাচনী এলাকায় এসেছি। কারখানার প্রধানকে সে কথা জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনি বাংলাদেশের সত্যিকারের বন্ধু এবং আপনাকে অর্ধেক বাঙালি বলে মনে করি।' তাঁর এ কথা শুনে পুরো জায়গাটি হাসি ও হাততালিতে ভরে উঠল।

ভোলাতে মি. বাংলাদেশ

সাড়ে নয়টায় সিরাজগঞ্জ থেকে বঙ্গোপসাগরের ভোলা দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলাম। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এখানে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ২০০-এর বেশি লোক মারা গেছে। এর আগে ১৯৭০ সালে অন্য এক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে এই ভোলা এবং পাশের হাতিয়ায় অভূতপূর্ব ক্ষতি হয়েছিল। এসব কথা জেনে ভারী মন নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়লাম। ভাবছিলাম, দ্বীপবাসীর বিষণ্ন মুখ দেখতে হবে।

সিরাজগঞ্জ থেকে ভোলা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টার ফ্লাইট। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, আমার পূর্বধারণা ভুল। সূর্যের উজ্জ্বল আলোর নিচে যে বিপুলসংখ্যক দ্বীপবাসী অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের মুখে দুঃখের কোনো চিহ্ন নেই। কৃষিমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। শুনেছি, সেদিন সিরাজগঞ্জের চেয়ে বেশি—৩০ হাজারের অধিক—লোক সমবেত হয়েছিলেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে স্কুলশিক্ষক, অধ্যাপক, শ্রমিক ও কৃষিজীবী পর্যন্ত সব স্তরের লোক দ্বীপটির সব জায়গা থেকে এসে ভিড় জমিয়েছেন। কেউ কেউ ছাদের ওপর উঠে আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়াচ্ছেন। সিরাজগঞ্জের মতো এখানেও আমাকে গলা পর্যন্ত ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হলো।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা তোফায়েল আহমেদ মঞ্চে উঠে আমাদের জন্য স্বাগত ভাষণ দিতে শুরু করলেন। তিনি নাকি এই ভোলা দ্বীপ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর মি. সামাদ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। দুজনেই তাঁদের ভাষণে বাংলাদেশের জন্য চাল ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর জন্য আমার চেষ্টার প্রশংসা করেন। তাঁরা আমাকে 'মি. বাংলাদেশ' বলে পরিচয় করিয়ে দিলে উপস্থিত ৩০ হাজারেরও বেশি দর্শকের মধ্য থেকে গর্জনের মতো হাততালি ও হর্ষধ্বনি ভেসে এসেছিল।

তাঁরা সবাই জানেন যে আমি তাঁদের কাছে ঈশ্বর-সমতুল্য হিসেবে গণ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বন্ধু এবং গত দুই বছরে তাঁদের কষ্টের সময় জাপান থেকে যাতে বেশি সাহায্য দেওয়া হয়, সে জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছি। সেই সঙ্গে তাঁরা চান ঘূর্ণিঝড়ের

আঘাতে সাম্প্রতিক দুর্যোগের জন্য আমি যেন আবার কাজ করি। তাঁদের সেই আশার বহিঃপ্রকাশ দ্বীপবাসীর এই ভিড়।

আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে আমি প্রথমে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করলাম। তারপর বললাম, 'এখন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার সমর্থকে পরিপূর্ণ নিজের নির্বাচনী এলাকায় ফিরে এসেছি। আপনারা যত দিন সুখী হতে পারবেন না, তত দিন আমিও সুখী হতে পারব না। আজ আপনাদের আপ্যায়নে আমি মুগ্ধ ও আনন্দিত। আমি কথা দিচ্ছি, এই আনন্দের স্মৃতি মনে রেখে আপনাদের সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে জাপান থেকে আপনাদের জন্য আরও বেশি সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়া হবে, সেই উদ্দেশ্যে আমি আরও চেষ্টা করে যাব। জয় বাংলা!'

দর্শকেরা বিপুল হাততালি দিয়ে আমার বক্তৃতায় সায় দিয়েছেন। তারপর মি. তোফায়েল স্মৃতি হিসেবে আমার হাতে এক সুন্দর ছবি তুলে দিলেন। আমার জীবনে এই প্রথম এত বেশি লোকের সহজ-সরল ও উজ্জ্বল চেহারা দেখলাম।

পিছুটান থাকলেও আবার হেলিকপ্টারের আরোহী হতে হলো। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, ভোলা দ্বীপের যেন দ্রুত পুনর্গঠন হয়। একসময় জাপানেও ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বারবার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আজ ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশকে জাপানের এই অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি দিয়ে তাদের কষ্ট লাঘবে সাহায্য করার ইচ্ছা আমার আছে।

চট্টগ্রাম থেকে কাপ্তাই হ্রদে

আমাদের হেলিকপ্টার ১৯৭০ সালের দুঃখজনক স্মৃতিজড়িত হাতিয়া দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে বাংলাদেশের বৃহত্তম নৌবন্দর চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে। ভোলা থেকে এক ঘণ্টার যাত্রা। আকাশ থেকে দেখা চট্টগ্রাম একটি সুন্দর বাণিজ্যিক শহর। আকাশ থেকে জাপানের কোবে স্টিলের নির্মাণ করা স্টিল মিলের চিমনি দেখতে পেলাম। আমাদের সফরসূচি

অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরে কিছুক্ষণ থেকে শহরটি দেখতে যাওয়ার কথা থাকলেও সময়ের অভাবে বাদ দিতে হয়। বিমানবন্দর থেকে আমরা সরাসরি কাপ্তাই হ্রদের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বাংলাদেশে পর্যটন কেন্দ্রের সংখ্যা তেমন বেশি না হলেও সেগুলোর মধ্যে একটি এই কাপ্তাই হ্রদ। চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ২০ মিনিটে সেখানে পৌঁছে গেলাম। ব্যস্ত সফরসূচির কারণে আমাদের ক্লান্ত দেহ ও মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার এই কাপ্তাই ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটারের উচ্চতায় কাপ্তাই হ্রদের অবস্থান। সুন্দর হ্রদ। হ্রদের মধ্যে কয়েকটি ছোট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে যেগুলো সেখানকার দৃশ্যকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে। কাপ্তাই হ্রদ দেখে জাপানের ফুজি পর্বতকে ঘিরে পাঁচটি হ্রদের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। স্বচ্ছ ও নির্মল বাতাস। অক্টোবর মাসে অর্থাৎ শরতের প্রারম্ভে জাপানেও এ রকম আরামদায়ক আবহাওয়া পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা, বাংলাদেশে পাহাড় নেই। আমিও তা-ই ভাবছিলাম। তবে আসলে কাপ্তাইয়ের মতো পাহাড় ও হ্রদের সমন্বয়ে একটি সুন্দর পর্যটনস্থল আছে জেনে খুশি হলাম।

এ কে খান স্বাধীনতার আগে শিল্পমন্ত্রীর পদে ছিলেন। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি আমাদের জন্য নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। নৌকায় সুস্বাদু রান্না খেলাম। হ্রদের স্বচ্ছ-নীল জলের ওপর দিয়ে মাঝেমধ্যে সোনালি পাট বোঝাই করে পাল তোলা নৌকা চলে যেতে দেখা যায়।

জনাব খানের জামাতা জনাব সিদ্দিকী একজন সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ-জাপান সমিতির প্রেসিডেন্ট। পরে জানতে পারলাম যে তিনি জাপানের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য চাষের উন্নতি সাধনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। এখানে বর্তমানে এক লাখ মাছের চাষ করা হলেও তা তিনি ভবিষ্যতে চার লাখে উন্নীত করতে চান। তাঁর ধারণা, এই প্রকল্প জাপান ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধনের প্রতীক হিসেবে দেখা হবে। পরিকল্পনাটি চমৎকার। এর বাস্তবায়নে আমি সহযোগিতা করব।

বিকেল চারটায় কাপ্তাই ছেড়ে ঢাকায় ফিরে গেলাম। ততক্ষণে আকাশে সন্ধ্যার রং ধরেছে। আজকের দিনটি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে

হলেও সুন্দরভাবে কেটেছে। সেই সঙ্গে এও মনে হলো যে বাংলাদেশে অনুন্নত পরিবহনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হেলিকপ্টার বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রেসিডেন্টের নৈশভোজসভা

সন্ধ্যা ছয়টায় বাংলাদেশ-জাপান সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অভ্যর্থনায় অংশ নিতে গিয়েছিলাম। ড. চৌধুরীসহ সমিতির প্রধান সদস্যদের সঙ্গে আগে থেকে আমার পরিচয় আছে। তাই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে অভ্যর্থনাটি অনুষ্ঠিত হলো। দুই দেশের দুটি মৈত্রী সমিতির সহযোগিতায় ঢাকায় জাপানি ধাঁচের বাগান নির্মাণ, সমিতি থেকে প্রকাশিত সাময়িকীর বিনিময় এবং ছাত্র অর্থাৎ যুব বিনিময়ের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম।

সাড়ে সাতটা থেকে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর আয়োজিত নৈশভোজসভা শুরু হলো। এতে অর্থ, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীরা সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন। সেই সঙ্গে সরকারের বহু কর্মকর্তাও। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন তাঁর ভাষণে জাপানের চা অনুষ্ঠানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাপানিদের কর্মনিষ্ঠতা ও মনের জোর জাপানের বর্তমান সমৃদ্ধির ভিত্তি এবং জাপানিদের সেই মানসিকতার সঙ্গে চা অনুষ্ঠানের মূল ধারণার সম্পর্ক আছে।

আমাকে কিছু বলতে বলা হলো। আমি দাঁড়িয়ে আমার অনন্য ধারণা সবার সামনে তুলে ধরলাম। আমার মতে, ঘূর্ণিঝড় মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের একটি উপহার। কথাটা শুনে সবাই বিস্মিত হলেন। আমি ব্যাখ্যা করে বললাম, ২০ বছর আগে পর্যন্ত জাপানে তাইফুন নামে পরিচিত ঘূর্ণিঝড়কে শয়তানের উপহার মনে করা হতো। ১৯৬০ সালে মধ্য জাপানের নাগোইয়া শহরে আঘাত হানে তাইফুন। তাতে পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এ ছাড়া ওয়াকাইয়ামা জেলায় আমার নির্বাচনী এলাকায়ও প্রায়ই তাইফুনে ক্ষতি সাধিত হতো। কিন্তু দুর্যোগ মোকাবিলা পদ্ধতি ও কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে তাইফুনজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিম্নপর্যায়ে সীমিত রাখা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে তাইফুনের বাতাসের

সাহায্যে কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় দূষিত আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তাইফুনের বৃষ্টি আমাদের জীবনে অতি প্রয়োজনীয় পানি এনে দেয়। অর্থাৎ এখন তাইফুনকে ভগবানের উপহার বললেও অত্যুক্তি হবে না। এখন থেকে ১০-২০ বছরের মাথায় বাংলাদেশেও সামুদ্রিক ঝড়কে অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হতে পারে। এই ছিল আমার বক্তব্য।

আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে উঠলেন, 'মি. হায়াকাওয়া, আমার জানামতে জাপান অতীত থেকেই তাইফুনের দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছে। ১৩ শতাব্দীতে মোগল আক্রমণের সময় তাইফুন এসে তাদের হটিয়ে দেওয়ায় জাপান বেঁচে যায়।' তাঁর এই রসিক মন্তব্যে সবাই হেসে উঠলেন। ড. কামাল হোসেনের রসিকতা ও জাপান সম্বন্ধে তাঁর সমৃদ্ধ জ্ঞান দেখে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল আমাকে।

বিজয় দিবস

১৬ ডিসেম্বর সকালে কামানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আজ বিজয় দিবস, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। একদম পরিষ্কার আকাশ, এক টুকরো মেঘও দেখা যাচ্ছে না। আটটায় মি. কামাল হোসেন এসেছেন আমাকে নিতে। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। পুলিশের গাড়ির পাহারার মধ্যে অনুষ্ঠানের জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন খাতের নেতৃস্থানীয় লোকজন এবং বিদেশি প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। আমাকে প্রথম সারিতে মন্ত্রীদের পাশাপাশি বসানো হলো।

জাতীয় সংগীতের সুরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করলেন এবং নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। তারপর স্থল ও নৌ সেনাদের কুচকাওয়াজ আরম্ভ হলো। সুবিন্যস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কুচকাওয়াজ। আমার পাশে মি. কামাল হোসেন বসেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি নৌবাহিনীতে ছিলাম, সে কথা তাঁর অজানা নয়। কুচকাওয়াজ দেখতে দেখতে তিনি আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, অতীতের কথা মনে পড়ছে, তাই না? সত্যিই তো। বাংলাদেশি

সৈনিকের পোশাকের সঙ্গে অধুনালুপ্ত জাপানি নৌবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন ইউনিফর্মের মিল আছে।

কুচকাওয়াজ চলতে থাকল প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর মার্চিং ব্যান্ড মাঠে নামল। তাদের পরনে স্কটল্যান্ডের ব্যাগ-পাইপ বাদকের কিল্টের মতো পোশাক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য হতে পারে এটি। তাদের পরে এসেছিল বিভিন্ন সরকারি শিল্পপ্রাতিষ্ঠানের রথ। কৃষি, মৎস্য, বন, পাট, জাহাজ, বিদ্যুৎ ও তাঁতশিল্পসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিরা যখন মিছিল করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ করে জঙ্গি বিমানের বহর আকাশ দিয়ে উড়ে যায়। অনুষ্ঠানটি দেখতে দেখতে আমার এ কথাই মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশ এত দিনে একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন দেশে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেশটির উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো। সেই সঙ্গে এও মনে হলো যে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের আমাকে দেখে কেমন লাগছে? সেদিন আমি ছিলাম মন্ত্রীদের সঙ্গে একদম সামনের সারিতে একমাত্র বিদেশি।

দুপুর একটায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যাহ্ন ভোজসভা শেষ হলো। বিকেল চারটা থেকে প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে তাঁর সরকারি ভবনের বিশাল উদ্যানে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। দুই হাজারেরও বেশি আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমার বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে জেনে বিস্মিত এবং গর্বিত হলাম। শেখ মুজিবুর রহমান হাসিমুখে আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনাদের কোটের পকেটে সব সময়ই বাংলাদেশে আসার জন্য আমার আমন্ত্রণপত্র রয়েছে, সে কথা ভুলবেন না।'

সাড়ে পাঁচটা থেকে জাপানি দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত তাকাশি ওইয়ামাদার উদ্যোগে অন্য একটি অভ্যর্থনা। সেদিন দূতাবাসের বাগান থেকে দেখা সন্ধ্যার আকাশের রং কখনো ভুলতে পারব না। পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের রঙে রঞ্জিত দীর্ঘ টানা সন্ধ্যার মেঘ। অপূর্ব দৃশ্য। উষ্ণমণ্ডলীয় দেশ বলেই এ রকম সুন্দর সন্ধ্যার আকাশ দেখা যায়। আগে একবার আফ্রিকার কঙ্গো দেশে তোলা সূর্যাস্তের আকাশের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজকের ঢাকার আকাশ ঠিক সেই ছবির মতো। এই অভ্যর্থনায় মি. কামাল হোসেনসহ কয়েকজন মন্ত্রী, জাতিসংঘের কর্মকর্তা

এবং বাংলাদেশে প্রবাসী জাপানি নাগরিকসহ বহু লোক অংশগ্রহণ করলেন। কামাল হোসেন সারা দিন আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য আমি উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাইনি।

সারা দেশ বিজয় দিবসের আনন্দে মেতে উঠছে

সেদিন রাত আটটায় বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত পুরোনো রেসকোর্স ময়দানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রণ পেয়ে আমরাও উপস্থিত হলাম। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে অবাক হতে হয়, কারণ দুই লাখেরও বেশি লোকের সমাগম হয়েছে সেখানে। যত দূর চোখ যায়, শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। পেছনের দিকে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের মাথা দেখা যায় তিলের চেয়ে ছোট। দৃশ্যটি সত্যিই অবাক হওয়ার মতো। মঞ্চে নাটক ও গান পরিবেশন করা হলেও যাঁরা পেছনে রয়েছেন, সেই আওয়াজ তাঁদের কানে যাচ্ছে কি না সন্দেহ। তবে সবাই চুপচাপ হয়ে আগ্রহভরা চোখে মঞ্চের দিকে তাকাচ্ছেন।

শুনেছি বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এই প্রথম এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এক নাটক শেষ হলে মি. আবদুর রউফ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করলেন। আমার দোভাষী মি. জালাল জানালেন, মি. রউফ তাঁর ভাষণে বলছেন, বাংলাদেশের জাপানি বন্ধু মি. হায়াকাওয়া এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাকে নাকি কিছু বলতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে কেউ আমার কথা শুনতে পারবেন না, সেই সঙ্গে সবাই নিশ্চয়ই পরবর্তী নাটকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভেবে আমি কিছু না বলে শুধু দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ালাম। তার উত্তরে দর্শকদের আসন থেকে বিশাল ঢেউয়ের মতো হাততালি ও হর্ষধ্বনি উঠে আসে। এমন দৃশ্য জাপানে কখনো দেখতে পারব না। যেন সহজ-সরল জনগণের মধ্যে ঘুমন্ত ব্যাপক শক্তি হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। সেই রাতের আনন্দময় অনুভূতি আমি কখনো ভুলতে পারব না।

বিদায়ের দিন

১৭ ডিসেম্বর। সব সময়সূচি শেষ করে আজ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাব। বাংলাদেশকে বিদায় জানাতে হবে ভেবে মনে কষ্ট হচ্ছে। যাঁরা এখানে আমার দেখাশোনা করেছেন, তাঁদের হাতে জাপান থেকে নিয়ে আসা উপহারসামগ্রী কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুলে দিলাম। যে সাতজন সেনা আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদেরও শার্ট দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম। তাঁরা মুখে কিছু না বললেও চোখের ইঙ্গিতে আনন্দের ভাব প্রকাশ করলেন। মি. রউফকে দিলাম একটি ফাউনটেন পেন। কলমটি পেয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'বাংলাদেশে অবস্থানকালে আপনার সঙ্গী হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রধানমন্ত্রী রোজ সকালে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করতেন, জানতে চাইতেন আপনার ভালো ঘুম হয়েছে কি না। এই কলমটি আপনার স্মারকচিহ্ন হিসেবে আমি সযত্নে রাখব। আপনাকে চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজে এটি ব্যবহার করব না।' তাঁর কথা শুনে আমার চোখে পানি এল।

রাষ্ট্রদূত ওইয়ামাদাসহ জাপানি দূতাবাসের সব কর্মীও যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন যাতে আমার সফর সুষ্ঠু হয়। তাঁদেরও জাপানি নানা জিনিস উপহার দিলাম। সাধারণত জাপানি জিনিস কিনতে চাইলে তাঁদের ব্যাংকক পর্যন্ত যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হয়। তাই জিনিসগুলো দেখে তাঁরা মহা খুশি। বিশেষ করে, জাপানি মদ ও জাপানিদের অতি প্রিয় ঝলসানো উনাগি মাছ পেয়ে তাঁদের আনন্দের শেষ ছিল না।

জাপানের কাছে বাংলাদেশের আশা

সকাল আটটায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মি. নূরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক। তিনি দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো।

দুই বছর আগে আমার বাংলাদেশ সফরের পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জাপান বাংলাদেশের জন্য চাল, পোশাক, জাহাজ, বাস, ট্রাক সরবরাহ

এবং সার কারখানার পুনর্গঠনসহ প্রায় ১০ কোটি ডলারের সাহায্য প্রদান করেছে। এ দিনের বৈঠকে মি. নূরুল ইসলাম খাদ্য সাহায্য, ১০ হাজার টন জাহাজের লিজ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা নির্মাণসহ নতুন সাহায্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

অন্যদিকে আমি তেল উন্নয়নের ব্যাপারে জাপানের ইচ্ছার কথা তুলে ধরলাম। আমি তাঁকে জানালাম যে জাপান তেলের অভাবে হিমশিম খাচ্ছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরে তেলকূপ আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। আমি মি. নূরুল ইসলামের কাছে তেলের উৎস সন্ধানের জন্য জরিপ চালানো এবং খননের আধিকার জাপানকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে জাপান তেল উন্নয়ন সংস্থার আবেদনপত্র হস্তান্তর করলাম। তেল উন্নয়ন সংস্থা জাপান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। উত্তরে মি. নূরুল ইসলাম বললেন, ৫০টি দেশ বঙ্গোপসাগরের তেল উন্নয়নে আগ্রহ ব্যক্ত করলেও জাপানের ইচ্ছার কথা বাংলাদেশ অবশ্যই মাথায় রাখবে। তিনি এও জানান, অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশ সরকার।

সাড়ে নয়টায় সংসদ ভবনে স্পিকার মো. মোহাম্মদউল্লাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার। অনুচ্চ ও ফরসা হওয়ার কারণে তিনি দেখতে জাপানিদের মতো। তাঁর পণ্ডিত পণ্ডিত ভাব দেখে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর যোদ্ধা ছিলেন বলে বিশ্বাস হয় না।

সাক্ষাতের সময়ে তাঁর একটি কথা আমার মনে দাগ কেটেছে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রার্থনা করছিলেন একই এশিয়ার দেশ জাপানের জয় হোক। একই ধরনের কথা এর আগে দেখা হওয়া যোগাযোগমন্ত্রী মনসুর আলীর মুখেও শুনতে পেলাম। এর থেকে বোঝা যায়, এশিয়ার জনগণের কাছে একদা জাপানের প্রতি মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধের সংগ্রামে যোদ্ধা হিসেবে তাদের আশা কত বড় ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনে

তারপর ১১টার সময় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। এখানে এসেছি এ নিয়ে দুবার। দুই বছর আগে যখন আসি,

তখন দেখেছিলাম প্রচুর লোকের ভিড়, যাঁরা এসেছিলেন কাজের খোঁজে অথবা কষ্টকর জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর অফিসঘরে একটি খাট রাখা হয়েছে, অতি ব্যস্ততার মধ্যে বাসায় যাওয়ার সময় না থাকলে তিনি যেন এখানে রাত কাটাতে পারেন, সেই জন্য। তবে এখন জায়গাটা একেবারে অন্য রকম। সমস্ত ভবনটাকে ছিমছাম সাজানো হয়েছে এবং লোকের ভিড় নেই। আমি সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে হাজির হয়েছেন, যেন আমার অপেক্ষা করছিলেন। করমর্দনের পর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করার মতো করে নিয়ে গেলেন তাঁর কক্ষে। ঘরের জানালা দিয়ে বাগান দেখতে পেলাম। বাগানের লন-ঘাস অতি সুন্দর করে কাটা হয়েছে এবং গাছে গাছে গজে উঠেছে নতুন পাতা। ঘরের পেছনের আলমারিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছবির পাশাপাশি আমাদের সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর ছবিও সাজানো ছিল।

তাঁর সঙ্গে বসে আলোচনা শুরু করব, এমন সময় তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রীকে আজ সঙ্গে করে নিয়ে আসেননি কেন?' আমার সঙ্গে রাষ্ট্রদূত ওইয়ামাদা ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সস্ত্রীক যোগ দেওয়া জাপানে শিষ্টাচারবহির্ভূত। তবু প্রধানমন্ত্রী রাজি হলেন না। রীতিমতো রেগে গিয়ে বললেন, 'কূটনৈতিক রেওয়াজ নিয়ে এত মাথা ঘামানোর দরকার কী?' জনসাধারণের মধ্যে থাকা রাজনীতিবিদের কাছ থেকেই কেবল এ রকম মন্তব্য আশা করা যায়। যা হোক, আমি তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, 'আপনি আমার প্রতি এত অন্তরঙ্গ ভাব দেখাচ্ছেন বলে ওর হিংসে হয়েছে। তাই উনি আসতে চাননি।' আমার রসিকতা শুনে শেখ মুজিবুর রহমান হো হো করে হেসে উঠলেন।

বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের শুরুতে আমি এবারের বাংলাদেশ সফরকালে আমার প্রতি যে সহৃদয়তা দেখানো হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। তারপর আসন্ন অর্থনৈতিক মিশনের প্রসঙ্গ তুলে ধরলাম।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে জাপানি ব্যবসায়ী নেতা মি. শিগেও নাগানোর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসবে। জাপানের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই দলে থাকবেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলাম, এই মিশন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারবে এবং আপনারা তাঁদের যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খুশি হব। উত্তরে তিনি বলেন, তখন সংসদের অধিবেশন চলতে থাকলেও তিনি জাপানি প্রতিনিধিদলের জন্য ইতিমধ্যে পাঁচ দিন বরাদ্দ রেখেছেন।

তারপর বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হলো। আমি আমার মতামত জানিয়ে বললাম, জাপান বাংলাদেশের জন্য সরকারি সাহায্য দেওয়া অব্যাহত রাখবে বটে, তবে সেই সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। জাপান ভ্রমণের সময় প্রধানমন্ত্রী জাপান থেকে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। আমার অনুরোধ, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হোক, যেমন কর ও মুনাফার অর্থ স্বদেশে পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা থাকলে ভালো হবে। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাপান থেকে ফিরে আসার পরপরই তিনি আইনব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের আদেশ দিয়েছেন, যাতে সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ শেয়ার পর্যন্ত বৈদেশিক মালিকানার অনুমতি দিয়ে যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়। জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পাঁচ তারার হোটেল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রেও জাপানি কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে বাংলাদেশ আগ্রহী। জাপানি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তিনি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চান। এদিকে বাংলাদেশে এ বছর পাটের ভালো ফলন হচ্ছে। আজকাল কৃত্রিম আঁশের তৈরি বস্ত্রে নানা রকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় পুনরাবর্তনযোগ্য পাটবস্ত্রের ওপর লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। জাপানকেও পাটের আমদানি বাড়ানোর জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ রকম ছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য।

এরপর আমি বঙ্গোপসাগরে তেল উৎপাদনের বিষয় তুলে ধরলে প্রধানমন্ত্রী আমার কথায় বাধা দিলেন এবং উপস্থিত দুজন মন্ত্রীকে ঘর

থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে তাঁর এই সতর্কতা। তারপর তিনি আমার দিকে মুখ ফেরাতেই আমি বললাম, 'জাপান এখন তেলসংকটের সম্মুখীন। আমাদের আশা, বঙ্গোপসাগরে তেলকূপের সন্ধান ও খননের অধিকার জাপানকে দেওয়া হোক। আপনার জাপান সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী কাকুয়েই তানাকা আপনাকে একই অনুরোধ করেছিলেন।'

প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে বড় ম্যাপ নিয়ে এলেন। ম্যাপে চিহ্নিত রয়েছে তেলের শিরা কীভাবে বিস্তৃত এবং কোথা থেকে তেল বেরিয়ে আসছে। সেগুলো দেখিয়ে তিনি আমাকে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝালেন, বঙ্গোপসাগরে তেল উৎপন্ন হওয়ার কত বড় সম্ভাবনা আছে। তারপর বললেন, 'আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মানুষ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস বঙ্গোপসাগরে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমি ভাবছি, যে এলাকায় সম্ভাবনা সব থেকে বেশি, সেখানে খননের অধিকার জাপানকে দিয়ে দেব।'

তাঁর কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি জাপানকে কত ভালোবাসেন। জাপান সরকার ও তেল উন্নয়ন সংস্থার এত দিনকার দুশ্চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর এই পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে। বঙ্গোপসাগরে সত্যি সত্যি তেল পাওয়া যাবে কি না, মাটি খুঁড়ে না দেখা পর্যন্ত তা জানা যাবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যাবে যে জাপানের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর ভালোবাসার কথা চিরদিন আমাদের মনে গেঁথে থাকবে।

আমরা হাতে হাত ধরে চলে যাই

বৈঠকের শেষ পর্যায়ে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানালাম, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা জাহাজ জাপান থেকে বাংলাদেশে পৌঁছাবে। তাঁর জাপান সফরের সময় জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সংস্থা এই জাহাজ উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমি এর নামকরণ করেছি 'সূর্যোদয়'। শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আঙুল দিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড় লেখন দেখিয়ে বললেন, এটা সূর্যোদয় নিয়ে লেখা

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। তিনি কবিতাটির মানে ব্যাখ্যা করে বললেন, এতে এমন আহ্বান রয়েছে যে রাতের শেষে সূর্যোদয়ের সময় আমরা সবাই হাতে হাত ধরে সামনে এগিয়ে যাই। এ রকম ঘটনাকে বলে মনের মিলন। কবিতার পাশে কবিগুরুর বড় প্রতিকৃতি রাখা ছিল। সময় কখন চলে গেল, বুঝতে পারিনি। পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেল মনের অজান্তেই। বিদায়ের সময় ভবনের সদর দরজা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আমাকে এগিয়ে দিলেন। শেষ অবধি তিনি আমার হাত ছাড়েননি। সদর দরজায় এলে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকেরা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ক্যামেরার শাটারের শব্দ বেজে ওঠে। তখন বাগান ভরে গিয়েছিল সূর্যের আলোয়। তৃপ্ত মন নিয়ে বিদায় নিলাম। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে বড় আনন্দ ও তৃপ্তি উপলব্ধি করলাম। দেড়টায় আমার বিমান বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে গেল। বহু লোক বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। বাংলাদেশ বিমানের একটি প্লেনে কলকাতা হয়ে জাপানে ফিরে যাব।

বিমানের আসনে বসে নানা ভাবনা মনে এল। বাংলাদেশে গেলে সবাই বাংলাদেশের প্রেমে পড়ে যায় কেন? তার কারণ হয়তো এই যে বাংলাদেশে এমন কিছু জিনিস আছে যা জাপানিদের মনে বিবেক ফিরিয়ে আনে। দেশটি গরিব হলেও সেখানে বহু সহজ-সরল ও দয়ালু মানুষ আছে।

আমি আমার দেশের মতো বাংলাদেশকে ভালোবাসি। সদ্য স্বাধীন হওয়া এই দেশটি সুষ্ঠুভাবে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হোক, বিমানের জানালা দিয়ে বাংলাদেশের মাটির দিকে চোখ রেখে মনের অন্তর থেকে সেই কামনা করছিলাম।

১০ মার্চ ১৯৭৪

প্রয়াত প্রেসিডেন্টের স্মরণে

স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, বঙ্গবন্ধু নামে পরিচিত অত্যন্ত লোকপ্রিয় নেতা এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধু প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ আগস্ট ভোরে তরুণ সামরিক অফিসারদের অভ্যুত্থানে তাঁর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে নিহত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬। এই দুঃসংবাদ শুনে মনে যে কষ্ট ও বেদনা পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

খবরটা শুনে অতীতে জাপানে ঘটে যাওয়া সামরিক অভ্যুত্থানের কথা মনে পড়ে গেল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ৎসুয়োশি ইনুকাই ১৯৩২ সালের ১৫ মে অভ্যুত্থানের শিকার হন। প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহী সেনাদের আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করলেও তারা তাতে কান না দিয়ে ইনুকাইকে গুলি করে হত্যা করে।

বিদেশি সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট যখন সকালের নামাজ শেষ করলেন তখন তরুণ সামরিক অফিসাররা তাঁকে আক্রমণ করে। প্রেসিডেন্ট নাকি তাঁর ভবনের দোতলা থেকে নামতে নামতে চিৎকার করে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও, যে আমাকে এমনকি ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোও হত্যা করেনি।' তারপর তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। অন্য একটি সংবাদ সংস্থার খবরে বলা হয়, অস্ত্র নামালে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবন ছেড়ে চলে যেতে রাজি আছেন বলে প্রেসিডেন্ট সেনাদের জানালেন, কিন্তু বিদ্রোহীরা সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে মেশিন গান চালিয়েছিল। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে অত্যন্ত মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি নিজের জীবন-মরণে কোনো গুরুত্ব দিতেন না। তাঁকে আটবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মোট সাড়ে ১০ বছর জেলখানায় বন্দী ছিলেন তিনি। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর ফাঁসি কার্যকর হওয়ার মাত্র দুই ঘণ্টা আগে অলৌকিকভাবে তাঁকে উদ্ধার করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের জনক হয়েছেন। সত্যিই আশ্চর্যজনক তাঁর জীবন।

সাফল্যের সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় লাখ লাখ মানুষের সামনে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'আপনাদের ভালোবাসা হারালে সঙ্গে সঙ্গে আমি অবসর নিতে প্রস্তুত থাকব। কিন্তু আপনাদের সবার মুখে যে দিন হাসি ফুটবে, সেই দিন পর্যন্ত আমি আমার প্রাণ দেশের জন্য উৎসর্গ করতে চাই।' তাঁর এই কথা এখনো আমার মনের মধ্যে বাজছে।

স্বাধীনতার পর চার বছর অতিবাহিত হলেও বন্যা, মুদ্রাস্ফীতি এবং দুর্নীতিপরায়ণ কিছু রাজনীতিবিদের জন্য জনসাধারণের হাসিমুখ দেখতে পাওয়াটা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায়ই এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছে বলে তাঁর মনের দুঃখ-কষ্ট আমি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটে এখন থেকে চার বছর আগে। বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলনে প্রণোদিত হয়ে ১৯৭২ সালের ১৪ মার্চে আমি সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশে গিয়েছিলাম জাপান সরকারের মৈত্রীদূত হিসেবে। তখন প্রথমবারের মতো তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার হয়। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসেবে তাঁকে অর্ধেক জীবন কাটাতে হয়েছিল কারাগারে। কিন্তু তাঁকে দেখে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল এবং আন্তরিক মানুষ। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের উদ্দেশে যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণসহ বেশ কয়েকটি আর্থিক সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁর অনুরোধমতো জাপানে ফিরে জাপান-বাংলাদেশ সমিতি প্রতিষ্ঠা করি এবং দুই লাখ টন

চাল সরবরাহ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার পথ সুগম করি। বলা বাহুল্য যে এতে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখছিলেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গত দুই বছর জাপানের বিশেষজ্ঞরা সেখানে গিয়ে মৌলিক গবেষণা চালাচ্ছেন। এসব সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিল।

দুই বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি অতিথি হিসেবে জাপান সফরে আসেন। জাপানি জনগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে, জাপান-বাংলাদেশ সমিতির উদ্যোগে টোকিওতে আয়োজিত অভ্যর্থনা সভা, আমোদ তরী সানফ্লাওয়ারে চড়ে টোকিও উপসাগর ভ্রমণের সময় তাঁর কন্যা-পুত্রের হাসি মুখ, ওয়াকাইয়ামা জেলায় আমার নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শনের সময় স্থানীয় লোকদের আনন্দভরা স্বাগত ধ্বনি আমি কখনো ভুলতে পারব না। জাপান সফরের সময় তিনি বারবার বলছিলেন, জাপানকে দৃষ্টান্ত ধরে নিয়ে তিনি দেশের পুনর্গঠনের কাজ করতে চান।

জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুইয়ে তানাকা শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে যখন বললেন, আধুনিক জাপানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিরোবুমি ইতোর সঙ্গে তাঁর মিল আছে, তখন তাঁর পাশে থাকা জাপান শিল্প ও বণিক সমিতির প্রধান শিগেও নাগানো বলে উঠেছিলেন, না, শুধু তা-ই নয়, জাপানের আধুনিকায়নে অন্যতম নেতা তাকামোরি সাইগোর সঙ্গেও তাঁর চেহারার মিল আছে। আবার তাঁর জাপান সফর শেষে বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানাতে আসা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাসাইয়োশি ওওহিরা আমাকে বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে শেখ মুজিব বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তিনজন রাজনীতিবিদের মধ্যে একজন। স্বল্পভাষী মি ওওহিরার মুখে এত প্রশংসা কদাচিৎ শোনা যায়। তাঁর জাপান সফরের ফলে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও উন্নত হয়ে মানুষে-মানুষে মনের সম্পর্কের পর্যায়ে তা পৌঁছে যায়।

১৯৭৩ সালের শেষ দিকে আমি প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। সেটি ছিল প্রথম সফরের দুই বছর পর আমার দ্বিতীয় বাংলাদেশ সফর। এই সফরকালে

তাঁর তুলনাহীন আন্তরিকতা ও সহৃদয় মনোভাব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারার মতো বেশ কয়েকটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

প্রথম ঘটনা ঘটেছিল আমার ঢাকা পৌঁছানোর দিনে। আমার প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে, যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও। আমার প্রতি বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর এক আকস্মিক আগমন।

সফরকালে আমি যেখানে যাই না কেন, হাজার হাজার মানুষ আমাকে স্বাগত জানালেন বাংলাদেশের সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে। যেখানে যাই না কেন, গলা ভরে যাওয়া ফুলের মালা দিয়ে আমাকে স্বাগত জানানো হতো। পরিষ্কার বুঝতে পারতাম এই আন্তরিক আপ্যায়নের পেছনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে।

বাংলাদেশে থাকাকালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একজন সাংসদ আবদুর রউফ সারাক্ষণ কাছে থেকে আমার দেখাশোনা করতেন। তাঁর মুখে জানতে পারলাম যে প্রধানমন্ত্রী রোজ সকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন আমার ভালো ঘুম হয়েছে কি না। তাঁর এত দয়ালু মনোভাবে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারতাম না।

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আমার অন্তহীন স্মৃতি আছে। মাত্র চার বছরের জন্য হলেও তাঁর মতো মহান রাজনীতিবিদের সঙ্গে যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পেরেছি তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। তিনি এবং তাঁর নিহত পরিবার-পরিজনের জন্য মনের অন্তর থেকে শোক প্রকাশ করি। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সাড়ে আট কোটি মানুষ, শেখ মুজিব তাঁদের খুব ভালোবাসতেন, তাঁরা এই দুঃখজনক ঘটনা অতিক্রম করে বিশৃঙ্খল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার মতো উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন, সেটাই আমার কামনা।

২৬ আগস্ট ১৯৭৫

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ

নতুন সরকারের আন্তরিক আচরণ

গত বছর [১৯৭৫] আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া সামরিক অভ্যুত্থানের পর এই প্রথম বাংলাদেশ সফরের সুযোগ পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে গত ১৬ মার্চ এক সপ্তাহের সফরের জন্য ঢাকায় গিয়ে পৌঁছলাম জাপান সরকারের মৈত্রী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে। দলে আমি ছাড়াও আছেন সরকারি ও বেসরকারি উভয় মহল থেকে মোট সাতজন প্রতিনিধি। এটি আমার তৃতীয় বাংলাদেশ সফর। যাওয়ার আগে সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জাপানের প্রতি নতুন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিল বটে, কিন্তু ঢাকায় গিয়ে বুঝতে পারলাম আমার সেই দুশ্চিন্তা একেবারে অনর্থক।

সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশাসন আমাকে যেভাবে আপ্যায়ন করত, ঠিক সেইভাবে আমাদের গ্রহণ করেছে নতুন সরকার। প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ও নতুন সরকারের মন্ত্রীরা আন্তরিকভাবে আমাদের স্বাগত জানান। জাপানি প্রধানমন্ত্রী তাকেও মিকির পত্র পৌঁছানোর জন্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে দেওয়া জাপানের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে দাঁড়িয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া জাপানকে তিনি আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন। তিনি এও বলেন, নেপালের রাজা বীরেন্দ্রের

অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশে ফেরার পথে জাপানের যুবরাজ ঢাকায় এসেছিলেন, তাতে তিনি গর্ব অনুভব করেন।

সংবাপত্রগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় রোজ আমার ছবি ছাপা হতো এবং জাপানের প্রতিনিধির গতি-প্রকৃতি নিয়ে খবর বেরোত। মনে হলো যেন 'জাপান সপ্তাহ' চলছে। ঢাকায় জাপানি দূতাবাসের কর্মকর্তাদের মতে, বিদেশি কোনো প্রতিনিধিদল নিয়ে এত বড় লেখালেখি এর আগে কখনো হয়নি। ফেঞ্চুগঞ্জ শহরে জাপানের সহযোগিতায় নির্মিত সার কারখানা পরিদর্শনে গেলে হাজার হাজার নাগরিক আমাদের অভ্যর্থনা জানান। ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে যাওয়ার সময় হেলিকপ্টার অথবা বিমানে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশ বিমানে প্রথম শ্রেণীর আসন না থাকলেও আমাদের জন্য বিশেষ আসন প্রস্তুত করা হয়। তাঁদের আন্তরিকতার সীমা ছিল না। বাংলাদেশের সরকার তথা জনগণ আমাদের যেভাবে গ্রহণ করলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁরা যে জাপানকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশ হিসেবে জাপানের ওপর তাঁদের যে বড় আশা রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। বাংলাদেশে সরকারের পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁরা বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে একইভাবে আমাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন, জানতে পেরে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হলাম।

সামরিক বাহিনী ও জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট মধ্যপন্থী সরকার

বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন? বর্তমান সরকারকে অভিহিত করা যেতে পারে সামরিক আইনের অধীনে সাবেক প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জিয়াউর রহমানকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত আধা সামরিক প্রশাসন হিসেবে। গত বছর আগস্ট মাসে একদল তরুণ সামরিক অফিসারের সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান নিহত হন। তারপর খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার গঠিত হলেও ২ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ পাল্টা অভ্যুত্থানের

মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁকে ভারতপন্থী বলে মনে করা হয়ে থাকে। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের লিবিয়ায় বহিষ্কার করলেও মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ৭ নভেম্বরে আবার পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান মধ্যপন্থী সরকারের পত্তন হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে মাঝেমধ্যে ইন্দোচীনের তিনটি দেশ অর্থাৎ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু ওই তিনটি সরকার থেকে বাংলাদেশ সরকারের মূলনীতির ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বৈপ্লবিক প্রশাসন না হয়ে একটি সংস্কারবাদী মধ্যপন্থী প্রশাসন। সুতরাং তাকে বরং মুক্তবিশ্বপন্থী প্রশাসন বলা উচিত। এই সরকারের নীতি পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি থেকে খানিকটা আলাদা। তাঁরা মনে করেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের বৈদেশিক নীতি বেশি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নঘেঁষা ছিল। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য জোটনিরপেক্ষতার আওতার মধ্যে থেকে বিশ্বের দুই শিবির থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখা। এই মূলনীতির অধীনে তাঁরা বৈদেশিক নীতিতে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে সমাজবাদের কিছুটা সংস্কার করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে আরোপিত নিয়মাবলি ব্যাপকভাবে শিথিল করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

এবার ঢাকায় গিয়ে আমি বর্তমান প্রশাসন সম্বন্ধে প্রবাসী জাপানিসহ বিভিন্ন মহলের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করেছি। অনেকের মতে, বর্তমান সরকার স্থিতিশীল রয়েছে। সামরিক বাহিনী এবং জনসাধারণের মধ্যে জেনারেল জিয়ার জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পথচারীদের মুখে উজ্জ্বল ভাব লক্ষ করা যায়। নিরাপত্তার অভাব নেই। অবশ্য আমার জিপে সব সময়ই ছয়জন সশস্ত্র সেনা পাহারা দিত। সরকারি অতিথি হয়ে আসার কারণে সম্ভবত এত কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা।

বর্তমান সরকারের স্থিতিশীলতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, এ বছর চালের ভালো ফলন হয়েছে। মোট এক কোটি ৩০ লাখ টনের মতো ফসল হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি ও নেপোটিজম বা স্বজনপ্রীতি কমে গেছে। পূর্ববর্তী প্রশাসনের আমলে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রবণতা

ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, নতুন অর্থনৈতিক নীতির অধীনে বেসরকারি পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বেশ খানিকটা উন্মুক্ত করায় দেশের অর্থনীতি চাঙা হচ্ছে। চতুর্থত, এ দেশের লোকজন এখন সচেতন যে ঘন ঘন প্রশাসন বদলে গেলে শেষ পর্যন্ত দেশের ক্ষতি হয়। আর পঞ্চম কারণ এই যে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকা কয়েকজন দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান; পরিকল্পনামন্ত্রী মির্জা নুরুল হুদা, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের ডিন ছিলেন; আর আছেন শিল্পমন্ত্রী হাফিজুদ্দীন, যাঁর পাকিস্তান আমলে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁদের মতো দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের উপস্থিতি সাধারণ লোকের সমর্থন আদায় করতে সহায়ক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। নতুন সরকারের কেউ আমার সামনে শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা করেননি। হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেছেন তাঁরা। তাঁদের এই মনোভাব আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

নতুন নায়ক জিয়াউর রহমান

এবার বাংলাদেশে থাকাকালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে চার-চারবার দেখা করার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে একবার তিনি নিজেই উপহারসামগ্রী নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে এসে হাজির হয়ে আমাকে অবাক করলেন।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি চট্টগ্রাম ডিভিশনে মোতায়েন ছিলেন এবং তিনিই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁকে স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর বলে মনে করা হয়। তাঁর বয়স এখন ৪২। গত বছরের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাময়িকভাবে কারাগারে আটক করা হয়। বলতে গেলে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন। দেহের গড়ন মজবুত, শরীরে কোনো মেদ নেই। ইগল পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর, যা আজকালকার জাপানি রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখতে পাই না। অতীতে সামন্তযুগের যোদ্ধা বা মেইজি পুনরুত্থানের

নায়কদের চোখে হয়তো এ রকম দৃষ্টি দেখতে পাওয়া যেত, যাদের তুমুল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে হয়েছিল। আমি ও আমার সহকর্মীরা জেনারেল জিয়ার চরিত্রে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর একটি ব্যবহার আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার সময় তিনি সব বিষয়ে খুব মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন এবং খাতায় কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। এর থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে তিনি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করতে বদ্ধপরিকর। স্বাধীন বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জায়গায় এখন নতুন নায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান আসছেন, এ কথা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম।

জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বেঙ্গল তেল কোম্পানি

আমাদের প্রচেষ্টার ফল হিসেবে জাপান থেকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য জাপানের বার্ষিক প্রত্যক্ষ সাহায্যের পরিমাণ ঋণ ও অনুদানসহ পাঁচ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া জাপান এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে পর্যাপ্ত না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দিয়ে থাকে। অন্যদিকে অবশ্য বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না। এই দুই ক্ষেত্রে কাঠামোগত সমস্যার কারণে দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর সমাধান করতে হবে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে আমরা মূলত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আলোচনার ফলে এ রকম ঠিক হয়েছে যে সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য দুই হাজারটি পাম্প ও সেই সঙ্গে চাল ক্রয় ও কৃষি-প্রযুক্তি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মোট এক কোটি ৫০ লাখ ডলারের অনুদান জাপান দিতে রাজি হয়েছে। তা ছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জে সার কারখানার নবায়ন, হোটেল নির্মাণ ও খাদ্যসামগ্রী মজুদ করে রাখার জন্য গুদামঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া, সেই সঙ্গে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যসংক্রান্ত সাহায্য,

প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্যকর ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনাসংক্রান্ত কারিগরি সহযোগিতাসহ ব্যাপক বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ থেকে পাটের সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য এবং সামুদ্রিক পণ্যের জাপানে রপ্তানি বৃদ্ধি তথা ইলেকট্রনিক, তৈরি পোশাক, চামড়া, সামুদ্রিক পণ্যের মতো শিল্প ও গোলাপি মুক্তা চাষের খাতে জাপানের বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়েও কথা বলতে পেরেছি। বর্তমান সরকারের উন্মুক্ত অর্থনৈতিক নীতি এসব ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাটি খুঁড়ে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে তেলের খনি উন্নয়ন। ভূতাত্ত্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের ফলে বঙ্গোপসাগরে তেলের খনি আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুই বছর আগে বাংলাদেশ সফরের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে বঙ্গোপসাগরে তেল খননে জাপানের অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি আদায় করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জাপান সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ উদ্যোগে বেঙ্গল তেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ইতিমধ্যে বঙ্গোপসাগরে প্রয়োজনীয় স্থাপনা তৈরি করে খননের কাজ শুরু হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় তেল খনন দেখতে যাওয়ার সুযোগ হলো। প্রথমে ঢাকা থেকে ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে করে এক ঘণ্টার উড়নে চট্টগ্রাম, তারপর সেখান থেকে তেল কোম্পানির হেলিকপ্টার যোগে দক্ষিণের দিকে এক ঘণ্টা ২০ মিনিটের ফ্লাইটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছালাম। তীব্র রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ঘন নীল সমুদ্রের ওপর পরীক্ষামূলক তেল খননের স্থাপনা চোখে পড়ে। স্থাপনাটি যেন জলেভাসা জাঁকজমকপর্ণূ দুর্গ শহর। সেখানে জাপানি কর্মীরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে আমার মন বিশেষ অনুভূতিতে ভরে গেল। এখান থেকে সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এ রকম জায়গায় তাঁরা দিনের পর দিন চুপচাপ তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের অতি উচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতা সত্ত্বেও জাপানি কর্মীরা বিনীতভাবে কাজে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের শান্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ অথবা নতুন যুগের পথনির্দেশক বলে আখ্যায়িত করা যাবে।

স্থাপনার দায়িত্বে যিনি আছেন সেই মি. কাযুমি আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এক জায়গায় খননের কাজে ব্যবহৃত প্রচুরসংখ্যক পাইপ রাখা ছিল। পাইপগুলো জাপান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে আজ পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে ১২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক খননের কাজ চালানো হয়। সরেজমিন পরিদর্শনের পর কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমাদের হেলিকপ্টারের উদ্দেশে হাত নাড়াচ্ছিলেন জাপানি কর্মীরা। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হোক।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার কাঙ্ক্ষিত পরিণাম কী? আমার মনে হয়, কারখানা অথবা স্থাপনা নির্মাণ করে ঋণগ্রহীতা দেশের জনসাধারণকে উপকৃত করার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া দেশ এবং গ্রহীতা দেশের নাগরিকদের মধ্যে স্থায়ী মনের সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি করতে পারলে সাহায্য দেওয়া সার্থক হবে। আর আমার মতে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আদর্শগত নমুনা খুঁজতে গেলে বাংলাদেশের কথাই উল্লেখ করা যাবে। ফেঞ্চুগঞ্জে স্থানীয় লোকেরা আমাদের যেভাবে স্বাগত জানালেন, তা দেখলে বোঝা যায়, তাঁরা জাপানের সাহায্য পেয়ে সত্যিই আনন্দিত। এ ধরনের সম্পর্ক যত দিন টিকে থাকবে, তত দিন জাপানকে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়া অব্যাহত রাখা উচিত। সাহায্য নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার আনন্দ যে বেশি, সব জাপানি নাগরিকের সে কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা

যত দিন বাংলাদেশে ছিলাম, তত দিন স্থানীয় খবরের কাগজে এক সমস্যার কথা ঘন ঘন তোলা হতো। সমস্যাটি গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বসবাসকারী আড়াই কোটি মানুষের জীবন গঙ্গার ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু গত বছর ভারত দ্বিপক্ষীয় অভিন্ন সীমান্তের কাছে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে হুগলি নদীতে ৮০ শতাংশ পানি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ভারতের উদ্দেশ্য কলকাতা বন্দরের পানি গভীর করে বন্দরের কার্যক্ষমতা বাড়ানো। এই ব্যবস্থার ফলে কিন্তু বাংলাদেশে

বয়ে আসা পানির পরিমাণ দ্রুত কমে যায় এবং তার বিভিন্ন কুফল দেখা দিতে শুরু করে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চিফ অব স্টাফ অ্যাডমিরাল মোশাররফ হোসেন খান পানিসম্পদমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। আমাদের সঙ্গে আলোচনায় অ্যাডমিরাল খান এই পানি বণ্টনের বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিয়েছিলেন। বললেন, ভারতের এই একতরফা পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশে প্রবাহিত পানির পরিমাণ ৮০ শতাংশ কমে গেছে। এতে সেচের জন্য পানির অভাব দেখা দেওয়ায় আড়াই কোটি লোকের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। নদীতে মাছের সংখ্যাও কমেছে। এভাবে চলতে থাকলে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাণীর বৈচিত্র্য ও সংখ্যা দ্রুত কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খুলনা শহরে শিল্পে ব্যবহৃত পানিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। নৌকা চলাচলেও বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ ভারতের এই পদক্ষেপ কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়—এই হলো তাঁর বক্তব্য। অ্যাডমিরাল খানের সঙ্গে এই আলোচনার দুই দিন পর সুন্দরবন পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। গঙ্গা (পদ্মা) নদীর মোহনায় বিস্তৃত এই বিশাল জলাভূমিতে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বিভিন্ন দুর্লভ প্রাণীর বাস। সম্ভবত আমরাই ছিলাম জনবিরল এই এলাকায় প্রবেশকারী প্রথম জাপানি। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে ৭০ মিনিটের পথ। আমাদের হেলিকপ্টার পদ্মা নদীর মূল স্রোতের ওপর দিয়ে উড়ে সুন্দরবন এলাকায় প্রবেশ করল। আকাশ থেকে দেখতে পেলাম অসংখ্য শাখানদী মাটির ওপরে মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত। সেই দৃশ্য উপভোগ করতে করতে সর্বদক্ষিণে অবস্থিত নীলকমলে (হিরণ পয়েন্ট) পৌঁছে গেলাম।

শক্তি দিয়ে পানি দখল চলবে না

আকাশ থেকে পদ্মা নদীর এখানে-সেখানে চর দেখতে পেলাম। শাখানদীগুলোতে স্রোত নেই। কেবল ধূসর রঙের পানি জমে আছে। শুকনো মৌসুম বলেই হয়তো এই অবস্থা, কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবেও

এ রকম হতে পারে। আমাদের হেলিকপ্টার নীলকমলে নামলে স্থানীয় জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমান্ডার ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর সেনাসহ বহু লোক আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। আমি তাঁদের উদ্দেশে হাত তুলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে সম্বোধন করলে তাঁরাও 'হায়াকাওয়া জিন্দাবাদ' বলে হাসিমুখে উত্তর দেন। উপকূল রক্ষী বাহিনীর নৌকায় করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন প্রদক্ষিণ করলাম। টেলিভিশনে দেখা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী বরাবর বিস্তৃত দুর্গম জঙ্গলের কথা মনে পড়ে গেল। বাঘ দেখার সুযোগ না হলেও অসংখ্য পাখি কলকাকলি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়।

নৌকার ডেকে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে লাঞ্চ খেলাম। এরপর জেলা প্রশাসক ভারতের পানি-বণ্টনজনিত সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। অ্যাডমিরাল খানের মতো মোটামুটি একই কথা বললেন তিনি। পরের দিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমার ছবি বড় করে ছাপা হয়। আমি যখন হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে পদ্মা নদীর চরগুলো দেখছিলাম, তখন তোলা ছবি। তার পাশে লেখা ছিল, গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গার পানি বণ্টন প্রশ্নে মি. হায়াকাওয়া বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সমঝোতা ও সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। পড়ে অবাকই হতে হলো।

পানি বণ্টন সমস্যা পৃথিবীর যেকোনো দেশে ঘটে থাকে। পানি নিয়ে বিরোধ কোনো দেশের অভ্যন্তরেও হয় আবার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যেও এই গন্ডগোল দেখা যায়। আসলে নদী হচ্ছে মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের উপহার। যদি বাংলাদেশের দাবির মতো ভারত গঙ্গার পানি বলপূর্বক দখল করে থাকে এবং বাংলাদেশকে একতরফাভাবে পরিণামের ভুক্তভোগী হতে হয়, তবে সেটি হবে মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ লঙ্ঘন এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ চুপ করে থাকবে না। আমি বরাবর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখতে আগ্রহী। গঙ্গার পানি বণ্টনের বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের সংকট উপলব্ধি করে দুই দেশের মধ্যে দ্রুত আলোচনার আয়োজন করতে রাজি হবে বলে আমি আশা করি। গঙ্গার পানির ন্যায্য ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে দুই দেশ সচেষ্ট হবে বলে কামনা করি। (আজ ১০ এপ্রিল বিদেশি সংবাদ সংস্থার খবর পড়ে জানতে পারলাম যে ভারত পানি বণ্টনের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিতে রাজি হয়েছে।)

নিজের দেশের মতো বাংলাদেশকে ভালোবাসি

আমাদের বাংলাদেশ ভ্রমণের শেষ দিন রাতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে আমাদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় মন্ত্রণালয়ের সব সদস্য যোগ দেন। আমাদের দলের হয়ে আমি কৃতজ্ঞতাসূচক বক্তব্য দিলাম। বললাম, আমি নিজের দেশ জাপানের মতো করে বাংলাদেশকে ভালোবাসি এবং কামনা করে থাকি যে একদিন বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো সোনার বাংলায় পরিণত হবে। আমার পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান দাঁড়িয়ে মনোমুগ্ধকর ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'মি. হায়াকাওয়া এবং প্রতিনিধিদলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনাদের এখানে গ্রহণ করতে পেরে বাংলাদেশিরা সকলেই গর্ব বোধ করছে। মি. হায়াকাওয়া, আমাদের দেশের জন্য আপনি কেবল একজন বন্ধু নন, তার চেয়ে বড় কিছু। বাংলাদেশের প্রতি আপনার গভীর শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও সহানুভূতির কথা বাংলাদেশের কারোরই অজানা নয়। আমরা মনে করি, আপনি সব সময় বাংলাদেশে থাকতে পারলে কতই না ভালো হতো। এবার আপনি এখানে শুধু জাপান সরকার ও জাপানি জনগণের শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে আসেননি, বরং বাংলাদেশের প্রতিটি মহলের জন্য আশা ও স্পৃহা এনে দিয়েছেন। আমরা সবাই এর জন্য কৃতজ্ঞ। আশা করছি, জাপানে ফিরে গিয়ে জাপান সরকার এবং জাপানি নাগরিকদের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। আমি নিশ্চিত যে আমরা চিরকালের জন্য এই শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব।

'মি. হায়াকাওয়া, এবারের সফর আরামদায়ক ও আনন্দময় হয়েছে বলে আমরা আশা করছি। আর আশা করছি, অল্পদিনের মধ্যে আবার আপনাকে আমাদের মধ্যে পাব। আসসালামু আলাইকুম।'

স্বাধীনতার পাঁচ বছর পর বাংলাদেশের লোকজন তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে শুরু করেছেন যে স্বাধীনতার পরপর তাঁদের দেখা গোলাপি স্বপ্ন ত্যাগ করে কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে এবং শুধু পরিশ্রম, ধৈর্য ও বুদ্ধি খাটানোর মধ্য দিয়েই দেশ গঠনের মহান কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। বাংলাদেশের উজ্জ্বল ও সম্ভাবনায় ভরা ভবিষ্যতের জন্য মনের গভীর থেকে প্রার্থনা করে এই ফলপ্রসূ সফরের ইতি টানলাম।

১০ এপ্রিল ১৯৭৬

বিমান ছিনতাই ঘটনা : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বিশেষ দূত হিসেবে বাংলাদেশ সফর

এবারের সফর ছিল আমার চতুর্থ বাংলাদেশ সফর, কিন্তু এবার বেশ ভারী মন নিয়ে যেতে হলো। তার কারণ, জাপানি লাল ফৌজের ঘটানো বিমান ছিনতাই ঘটনায় বাংলাদেশকে বড় বেগ পেতে হয়েছে আর একই সময় ঘটে যাওয়া বিদ্রোহে বিমান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের বড় দায়িত্ব পালনকারী এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদের শ্যালকসহ অনেক সেনা অফিসার হতাহত হয়েছেন।

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৮ জনের মৃত্যুদণ্ড ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে এবং আরও ৫০ জনকে একই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় আমাকে সাগ্রহে গ্রহণ করা হবে কি না, তা নিয়ে আমার মনে দুশ্চিন্তা ছিল।

কিন্তু ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে বুঝতে পারলাম, আমার সেই চিন্তা একেবারেই অনর্থক। বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছেন স্বয়ং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ শামসুল হক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রসচিব, বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সমিতির প্রেসিডেন্টসহ সরকারি ও বেসরকারি উভয় মহলের বহু বিশিষ্ট লোকজন। প্রচুর ফ্ল্যাশ বাল্বের ঝলমলে আলোর মধ্যে আমাদের ফুলের মালা উপহার দেওয়া হলো। খানিক দূরে থাকা কন্ট্রোল টাওয়ারে অনেক নাগরিক হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিলেন। দিনের বেলার কুয়াশার মতো আমার দুশ্চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেছে।

বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পর্যন্ত রাস্তা আগের মতো রিকশায় ভরা ছিল, কিন্তু রাস্তা একেবারে ধুলোমুক্ত। নীল আকাশের নিচে রাস্তার দুই ধারে গাছের পাতাগুলো ঝলমল করছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঢাকার এক হোটেলে বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে আমাদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করা হলো। এতে এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদকে উপস্থিত হতে দেখে বেশ অবাক হলাম। আমি সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম এবং বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সমাধানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য সব জাপানি নাগরিকের হয়ে ধন্যবাদ জানালাম। তাঁর শ্যালকসহ বিদ্রোহে যাঁদের জীবন দিতে হয়েছে, তাঁদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। উত্তরে এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ বিনীতভাবে বললেন, 'আমি আমার দেশের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দেশের জন্য যা করণীয়, সেটুকু করেছি মাত্র। আপনি বিশেষ দূত হিসেবে কষ্ট করে এসেছেন, তাতে আমি বরং বিব্রত বোধ করছি।' তাঁর এই কথা আমার মনে নাড়া দেয়। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের সঙ্গে বৈঠকেও এই একই কথা আমাকে জানানো হলো।

পরের দিন অর্থাৎ ২৯ তারিখে মি. মাহমুদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সময় আমি আবার তাঁর অবদানের প্রশংসা করলাম। বিমান ছিনতাই ঘটনা নিয়ে তিনি বললেন, 'পুরো পাঁচ দিন কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে বিমানদস্যুদের সঙ্গে জিম্মিদের মুক্তির জন্য যখন কথা বলছিলাম, আমার মাথায় তখন সব সময় ছিল পণবন্দীদের জীবন রক্ষা এবং এই ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জাপান সরকারের পরিষ্কার নীতির কথা। আমি এই নীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সম্ভাব্য সব উপায় কাজে লাগিয়ে সব পণবন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করলেও হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিদ্রোহের কারণে বিমানটিকে ১৯ জন পণবন্দীসমেত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

জাপানি লাল ফৌজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা শুধু সুপরিকল্পিত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল তা নয়, অত্যন্ত অহংকারী ও অবাধ্যও ছিল।

বিমান ছিনতাইকারীদের দাবি সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাদের বিভিন্ন দাবি

থাকলেও সেগুলোর মধ্যে ন্যূনতম দাবি মেটানোর চেষ্টা করেছি। সর্বক্ষণ আমার মনে ছিল যে ছিনতাইকারীদের সঙ্গে এই দর-কষাকষির পরিণতি এমন হতে হবে, যা বাংলাদেশ ও জাপান উভয় দেশের সরকারকে যেমন কলঙ্কিত না করে।

কলেরার সন্দেহের কারণে জিম্মিদের মধ্যে সবার আগে যে মিসরীয় দম্পতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে মি. মাহমুদ বলেন, তিনি প্রথমে ওই মুক্তির ব্যাপারে বেশ সন্দিহান ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে, মিসরীয়দের সঙ্গে ছিনতাইকারীদের যোগসূত্র থাকতে পারে। তাই তিনি দুজনকে কড়া পাহারার মধ্যে রেখেছিলেন এবং বাইরের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেননি।

পণবন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে জাপানের কারাগারে আটক লাল ফৌজের এক সদস্য জুনযো ওকুদাইরাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে মি. মাহমুদ বলেন, ছিনতাইকারীদের সঙ্গে দর-কষাকষিতে ওকুদাইরাকে তিনি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ওকুদাইরার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁর করণীয় সম্পর্কে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। ওকুদাইরা তাঁর ইচ্ছে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে সম্ভাব্য সবকিছু করতে তিনি প্রস্তুত, যদিও ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনার সফলতা সম্বন্ধেও কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। প্রাথমিক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা অন্তত ৮০ জন জিম্মিকে তাদের কাছে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকুদাইরাকে পাঠিয়ে মি. মাহমুদের ধারণা জানার পর তারা পণবন্দীদের সংখ্যা ৩৬ পর্যন্ত কমিয়ে আনতে রাজি হয়।

এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ফুকুদার কাছ থেকে কয়েকবার টেলিফোন পেয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছাকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে সব পণবন্দীর নিরাপদ মুক্তির জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলাম। অন্যদিকে বিমান ছিনতাইকারীরা শুরু থেকেই স্থির করেছিল যে তারা তাদের শেষ গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত একাধিক দেশের নাগরিকদের জিম্মি হিসেবে তাদের সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, সৈন্যদের বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯ জন জিম্মিসমেত বিমানটিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবে ওই পরিস্থিতির মধ্যে

বাংলাদেশ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, সে কথা জাপানের সরকার ও মানুষ জানুক সেটাই বাংলাদেশের কামনা।'

জাপান এয়ারলাইনসের বিমান ছিনতাই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত সব যাত্রী এবং ক্রুকে মুক্ত করা হয় এবং বিমানটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে মি. মাহমুদ অভিনন্দন জানান। সেই সঙ্গে তিনি বিনীতভাবে বললেন, মানুষের জীবনকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়ায় জাপান সরকারের পরিষ্কার নীতি, ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পরিবহনসচিব হাজিমে ইশিইর নেতৃত্বে জাপানি প্রতিনিধিদলের অসীম প্রচেষ্টা এবং ঢাকার জাপানি দূতাবাসের কর্মীদের সহযোগিতা ছাড়া এ ঘটনার সমাধান হতো না।

এয়ার ভাইস মার্শালের কথার শেষে আমি তাঁকে বললাম, বিদ্রোহের সময় বিমানবন্দরে নিহত ১১ জন সেনা অফিসারের পরিবার-পরিজনকে শোক প্রকাশের জন্য জাপান সরকার কিছু অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক। কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, জাপান সরকারের সদিচ্ছাকে বাংলাদেশ সম্মান দিলেও নিহত অফিসাররা সৈন্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেই পরিণাম ভোগ করেছেন এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন যাতে সসম্মানে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য দেবে। সুতরাং বাংলাদেশের সবিনয় আবেদন এই যে, জাপান সরকার যেন সে রকম সাহায্যের কথা না ভাবে। মি. মাহমুদের মধ্যে আমি কাঙ্ক্ষিত সামরিক অফিসারের প্রতিকৃতি যেন দেখতে পেলাম। তাঁকে দেখে পুরোনো জাপানের সামুরাই যোদ্ধার কথা মনে পড়ল। মুখে মিষ্টি কথা আদৌ না বলে বিনয়ের সঙ্গে শুধু মনের কথাই বলেন তিনি। আজকালকার জাপানিদের মধ্যে এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

হাতে হাত ধরে চলতে থাকব

এরপর ঢাকায় নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে প্রবাসী জাপানি নাগরিকদের অংশগ্রহণে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত সবাই একযোগে বললেন, বাংলাদেশ সরকার দক্ষতার সঙ্গে এবারের ঘটনার

মোকাবিলা করেছে এবং জাপানের উচিত বাংলাদেশকে এ জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।

দুপুর একটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে হাজির হলাম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের জন্য। দেড় বছর আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেছিলাম। গত দেড় বছরে তাঁর চুল বেশি পেকেছে বলে মনে হলো। দেশ পরিচালনার বড় দায়িত্বের কারণে হয়তো তাঁর মাথার এই অবস্থা। তবে তিনি হাসিমুখে আমাকে গ্রহণ করলেন এবং প্রায় আলিঙ্গন করার মতো করে আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার, এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ, অ্যাডমিরাল মুশাররফ হোসেন খান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক, পরিকল্পনামন্ত্রী মির্জা নুরুল হুদাসহ মন্ত্রিসভার মুখ্য সদস্যরা অপেক্ষমাণ ছিলেন।

আমি প্রথমে মুখ খুলে প্রেসিডেন্টকে এইভাবে বললাম, 'সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিমান ছিনতাই ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আপনি এবং বাংলাদেশ সরকার যে মূল্যবান সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তার জন্য জাপান সরকার তথা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত সব যাত্রী ও ক্রুকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জাপানের সরকার ও লোকজন আনন্দিত। ওই বিমান ছিনতাই ঘটনার প্রায় একই সময়ে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল, আপনার নেতৃত্বে তার সমাধান ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাতে চাই। ছিনতাই ঘটনার সমাধানের উদ্দেশ্যে কর্মরত কয়েকজনকে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে বলে দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।'

উত্তরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন, 'মি. হায়াকাওয়া, জাপান সরকার আপনাকে যে বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন, সেটি বাংলাদেশের প্রতি জাপানের গভীর বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি এবং তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিমান ছিনতাই ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানকে আমাদের দায়িত্ব মনে করে সেই লক্ষ্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমাদের মনে আফসোস রয়ে গেছে যে আমরা হয়তো বা আরও ভালোভাবে কিছু করতে পারতাম, কিন্তু তখন আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা সম্ভাব্য সবকিছু করেছি বলে আমার ধারণা। এ

বিষয়টি আপনারা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আমরা খুশি হব। সব যাত্রীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরাও আনন্দিত।'

ঢাকা বিমানবন্দরে যেসব জাপানি যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাঁরা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি মানপত্র তৈরি করেছিলেন। আমার সফরসঙ্গী ও সাংসদ শিযুয়ে ইয়ামাগুচি প্রেসিডেন্টের হাতে সেটি তুলে দেন। মানপত্রটি পেয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। পরের দিন সব সংবাদপত্রের প্রথম পাতার প্রথম কলামে এই মানপত্রের ছবিসহ প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সব কাগজই লিখেছে, এই মানপত্র শুধু মুক্তিপ্রাপ্ত যাত্রীদের নয়, বরং সব জাপানি লোকের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। খবরের কাগজের বদৌলতে বাংলাদেশের সব মানুষ এই খবর জানতে পেরেছেন।

যা হোক, আমি প্রেসিডেন্টকে আমার মানসিকতার কথা জানিয়ে বললাম, 'জাপান বাংলাদেশকে এত বড় কষ্ট দিয়েছে বলে ভারী মন নিয়ে এই সফরে বেরিয়েছিলাম। এবার কোনো উপহার ছাড়াই শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিয়ে আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছি। আপনি এবং বাংলাদেশের নাগরিকেরা আমাকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করেছেন বলে মন বেশ হালকা হয়ে গেল।' এর উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, আন্তরিকতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তারপর আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্টের কাছে জাপান সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাকেও ফুকুদার আমন্ত্রণ, ঋণ ও অনুদানসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নারিতা বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমানের নিয়মিত চলাচলের প্রবর্তন, বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক উৎস উন্নয়ন, মুক্তা চাষ ও হৃদ্‌রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণ। বাংলাদেশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রেসিডেন্টের আমার সঙ্গে বৈঠকের জন্য এত বেশি সময় ব্যয় করাটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এটি জাপানের মানুষ ও আমার প্রতি প্রেসিডেন্টের বন্ধুত্বের প্রতিফলন বলে আমার মনে হয়েছে। জাপানের কিছু সংবাদপত্রে লেখালেখি হয়েছিল যে, এই বৈঠকে বিমান ছিনতাই ঘটনার কারণে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল বলে প্রেসিডেন্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটা একদম ভুল তথ্য এবং প্রেসিডেন্ট এ রকম কোনো অভিযোগ করেননি।

স্থানীয় সংবাদপত্রে কোথায় গিয়ে কী করলাম সে সম্পর্কে রোজ ছবিসহ খবর বের হতো। মাত্র তিন দিনের সংক্ষিপ্ত সফর হলেও এর মাধ্যমে জাপান ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে বলে আনন্দিত হলাম। জাপানি ভাষার এক প্রবাদে আছে, দুঃখই সুখের উৎস। এবার ঠিক তা-ই হয়েছে বলে আমার ধারণা।

বিদায়ের সময় প্রেসিডেন্ট আমাকে গত বছরের বাংলাদেশের কঠিন পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বললেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমে দেশের উন্নতির পথ খোলা যায়। জাপানের সঙ্গে হাতে হাত ধরে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে যেন অগ্রসর হয়, সেটাই আমাদের কামনা।

সংশ্লিষ্ট কিছু কথা

জাপান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে আমার বাংলাদেশ সফরের দেড় মাস পর অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে একটি ব্যবহৃত বোয়িং ৭০৭ বিমান কেনার তহবিল হিসেবে বাংলাদেশকে ৬০ লাখ ডলারের অনুদান দেওয়া হবে। আসলে আমি বিশেষ দূতের দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়ার শর্ত হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ফুকুদা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদের কাছে যে প্রস্তাব করেছিলাম, তার ভিত্তিতে এই সাহায্য দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে আমার দুটো প্রস্তাব ছিল : ১. সারা বিশ্ব জানে যে বর্তমানে জাপানের কাছে বিপুল পরিমাণে উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে যেতে হলে তার কিছু অংশ দরিদ্র দেশটিকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যেতে হবে। ২. টোকিওর কাছে নারিতা বিমানবন্দর উদ্বোধন সামনে রেখে বাংলাদেশ নিজস্ব মর্যাদার খাতিরে রাষ্ট্র-পরিচালিত বিমান সংস্থার জন্য নতুন বিমানবন্দর ব্যবহারের অনুমতি চাইবে এবং জাপানকে অবশ্যই তাতে সাড়া দিতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে পরিবহনমন্ত্রী হাজিমে তামুরার নীতিগত সম্মতি পাওয়া গেলেও অনুদানের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সচিবালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতের অমিল রয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে

বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আমাকে নির্দেশ করে বললেন, 'এবারের সফরের সময় ছিনতাই ঘটনার সমাধানে সহযোগিতার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁকে জানাবেন যে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে জাপান বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করতে প্রস্তুত এবং সে ব্যাপারে বাংলাদেশের ইচ্ছা জানার চেষ্টা করবেন।' তার ভিত্তিতে জাপান কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত নেবে বলে প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন।

ঢাকায় বৈঠকের সময় আমি প্রেসিডেন্টকে মি. ফুকুদার এই বাণী পৌঁছে দিলাম। শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। তারপর আমি সফরসূচি শেষ করে যখন বাংলাদেশ ছেড়ে রওনা হব, তার ঠিক আগের মুহূর্তে ঢাকা বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রসচিব তোবারক হোসেন আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, জাপান সরকার যদি ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত সাহায্যের বাইরে বাংলাদেশকে অনুদান দিতে রাজি থাকে, তবে প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে ব্যবহারযোগ্য একটি বিমান পেতে ইচ্ছুক। বিমানটি নতুন না হলেও চলবে। জাপান সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই অনুরোধের কথা বিবেচনা করলে আমরা বাধিত হব।

বাংলাদেশ বিমান সংস্থার বিমানে করে ঢাকা থেকে ব্যাংকক যাচ্ছি, তখন প্রেসিডেন্টের এই বিনয়ী অনুরোধ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। আমি যে বিমানে যাত্রা করছি, সেটিও একটি পুরোনো বোয়িং-৭০৭ বিমান। বাংলাদেশ এটি পেয়েছে পাকিস্তানের কাছ থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানের মাত্র তিনটি এয়ারক্রাফট রয়েছে আর সেই তিনটি বিমান দিয়ে ঢাকার সঙ্গে লন্ডন, দুবাই, ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরের সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। তার ওপর তারা টোকিওর সঙ্গে নিয়মিত বিমান চলাচল শুরু করতে চায়। এই অবস্থায় বাংলাদেশ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কেন বিমান পাওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তা বোধগম্য। এ ছাড়া সাহায্য প্রদানে জাপানের প্রস্তুতির কথা জেনে প্রেসিডেন্ট এমন অনুরোধ করেছেন। তাই অবশ্যই বাংলাদেশের অনুরোধে সায় দিতে হবে জাপানকে। এই সাহায্যের বাস্তবায়ন দুই দেশের মধ্যেকার আস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ কথা ভেবে আমি আমার কাঁধে পড়া বড় দায়িত্ব অনুভব করেছিলাম।

দেশে ফেরার পর আমি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ইচ্ছার কথা প্রধানমন্ত্রী, চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করলাম।

নানা উত্থান-পতনের পর শেষ পর্যন্ত এই সাহায্য বাস্তবায়িত হয়েছে বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ কখনো এই ৬০ লাখ ডলারের সাহায্যের জন্য আবদার করেনি। এটি দুই দেশের মধ্যে সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের প্রতীক। ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী একটি বোয়িং-৭০৭ বিমান বাংলাদেশকে প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময় বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বিমানটিকে 'সিটি অব টোকিও' নাম দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এই অপূর্ব ঘটনা নিঃসন্দেহে জাপানের প্রতি বাংলাদেশের গভীর বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭

জাপানের এশিয়ানীতির বিকাশের জন্য

সবাই সুখী না হলে আমিও সুখী হতে পারব না

সামরিক শক্তি ত্যাগ করার পর আন্তর্জাতিক সমাজে টিকে থাকতে গিয়ে জাপানকে নতুন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে হয়। আমার মতে, সেটি আত্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অন্বেষণ হওয়া উচিত। প্রতিবেশী এশিয়া দেশগুলোর কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করতে চাইলে জাপানকে কূটনৈতিক সচেতনতায় ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে।

সুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর এক রচনায় বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের অবস্থান উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর বর্তমান যুগে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। মানবজাতি যদি নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়, তবে তাকে বিশ্বের সবার সঙ্গে এক পরিবারের মতো করে বসবাস করতে শিখতে হবে। সমগ্র মানবজাতির সম্মুখীন এই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জাপান অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

আমার সামান্য অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গত সাত বছরে আমি বরাবর ভ্রাতৃত্বের বোধ নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসেছি। বাংলাদেশ যখন প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আমি টোকিওর মূল বিপণিকেন্দ্র গিঞ্জার রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতাম। আমার এসব চেষ্টার ফলে আমি যতবার বাংলাদেশে যাই, ততবারই আমাকে সত্যিকারের বন্ধু হিসেব গ্রহণ করা

হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রশাসনের রদবদল হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্কে কখনো ছেদ ধরেনি। বাংলাদেশিরা আমাকে আধা-বাংলাদেশি মনে করেন।

এবার বিশেষ দূত হিসেবে যাওয়ার সময় আমি কোনো কিছু সঙ্গে নিয়ে যাইনি, যা আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হতে পারত। আমি কেবল আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলাম। জাপানিদের ঘটানো বিমান ছিনতাই ঘটনায় ব্যাপক ঝামেলা পোহাতে হলেও আমার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মনোভাবে কোনো হেরফের হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ ও বাংলাদেশ সরকারের অন্য কর্মকর্তারা একে একে আমাকে জানালেন যে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশ জাপানের জন্য যা করণীয়, তা-ই করেছে। তাঁরা বলেন, 'জাপান সরকার কষ্ট করে বিশেষ দূত পাঠিয়েছেন বলে আমরা বরং অস্বস্তি বোধ করছি।' তাঁদের মুখে কখনো কোনো অভিযোগ শুনতে হয়নি। এই দুঃখজনক ঘটনার পরও দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হয়নি।

দেড় বছর আগে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে যাই। সেই সময় ফেঞ্চুগঞ্জ শহর পরিদর্শনে যাওয়ার সুযোগ হয়, যেখানে জাপানের সাহায্যে নির্মিত সার কারখানা রয়েছে এবং তার সংস্কারের কাজ চলছিল। সেখানে হাজার হাজার নাগরিক আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং ছেলেমেয়েরা কুচকাওয়াজ করে আমাকে স্বাগত জানায়। আমি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনের কথা খুলে বললাম এভাবে, 'আপনারা আমাকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন তাতে আমার মনে হচ্ছে যেন আমার নিজের এলাকায় ফিরে এসেছি। আমি এখন উপলব্ধি করছি যে সাহায্য নেওয়ার চেয়ে সাহায্য দেওয়ার আনন্দ আরও বড়। আপনারা সুখী হতে না পারলে আমি কখনো সুখী হতে পারব না। এই সার কারখানার সংস্কার হলে আপনাদের জীবনের উন্নতি হবে। তাই এই কাজের জন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাব।'

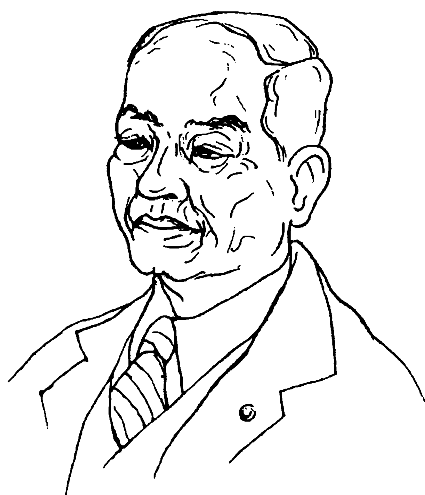
আমার কথায় ফেঞ্চুগঞ্জের নাগরিকেরা বিপুল হাততালি দিয়ে সাড়া দেন। জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় নির্মিত কারখানার মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি সম্ভবপর হচ্ছে। এর জন্য স্থানীয় মানুষ সাহায্যদাতার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমি বলব, সেটাই অর্থনৈতিক সহযোগিতার কাঙ্ক্ষিত রূপ।

জাপান প্রতিবছর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জন্য ঋণ ও অনুদানসহ প্রায় ১০০ কোটি ডলারের সাহায্য প্রদান করে থাকে। তবে এগুলো সেসব দেশের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক হচ্ছে কি না, তাতে বেশ সন্দেহ রয়েছে। থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারা বা জাপানের জাতীয় পতাকা পোড়ানোর ঘটনা এখনো আমার মনে আছে।

কূটনৈতিক চেতনা বদলানোর জন্য ছয়টি শর্ত

প্রধানমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা এশীয় জনগণের সঙ্গে মনের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে থাকেন। এর বাস্তবায়নের জন্য যা যা করণীয়, সে সম্বন্ধে আমার মত হলো, সরকারি ও বেসরকারি উভয় মহলের মনোভাবে পরিবর্তন আনতে হবে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই ছয়টি শর্তের সন্ধান পেয়েছি:

১. সাহায্যগ্রহীতার চেয়ে সাহায্যদাতারাই বেশি বড় আনন্দ পেতে পারে বলে জানতে হবে।
২. জাতীয়তাবাদের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের অধিকারী হতে হবে।
৩. প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাজার লাভের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়া চলবে না।
৪. নিজের দেশের শিল্পশক্তি বা মোট জাতীয় উৎপাদনের বিচারে মহাদেশসুলভ ব্যবহার করলে চলবে না। মানুষের সুখ মোট জাতীয় উৎপাদন দিয়ে মাপা যায় না।
৫. স্বার্থ বা দুর্নীতিজড়িত অর্থনৈতিক সহযোগিতা কখনো চলবে না।
৬. প্রত্যেক সাংসদকে জানতে হবে যে নিজের নির্বাচনী এলাকার ভালোর জন্য যেসব কাজ করতে প্রস্তুত, সেই একই মন নিয়ে কোনো একটি দেশ—যা বড় হোক বা ছোটই হোক—তার উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করে গেলে অবশ্যই একদিন তার সুন্দর ফল পাওয়া যাবে।



আ লো ক চি ত্র

জাপানে নিজের অফিসে তাকাশি হায়াকাওয়া



১৪ মার্চ ১৯৭২, গণভবনে বাঁ থেকে সাংসদ তাকাশি হাসেগাওয়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব, তাকাশি হায়াকাওয়া, সাংসদ তারো সুগা



১৫ মার্চ ১৯৭২, গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হায়াকাওয়া



অক্টোবর ১৯৭৩, হায়াকাওয়ার পশ্চিম জাপানের ওয়াকাইয়ামা জেলা ভ্রমণের সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হায়াকাওয়া, ড. কামাল হোসেন ও ওয়াকাইয়ামা জেলা গভর্নর মাসাও ওহাশি



১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩, ঢাকায় ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে হায়াকাওয়া



১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩, ভোলায় তাকাশি হায়াকাওয়া



১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩, বঙ্গভবনে



১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩, সিরাজগঞ্জে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হায়াকাওয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়



১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩, ভোলায় তাকাশি হায়াকাওয়া



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বঙ্গভবনের বাগানে তাকাশি হায়াকাওয়ার পাশে তাঁর স্ত্রী মোতোয়ে হায়াকাওয়া



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩, বঙ্গভবনের বাগানে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাকাশি হায়াকাওয়া ও মোতোয়ে হায়াকাওয়া



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩, ঢাকায় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান

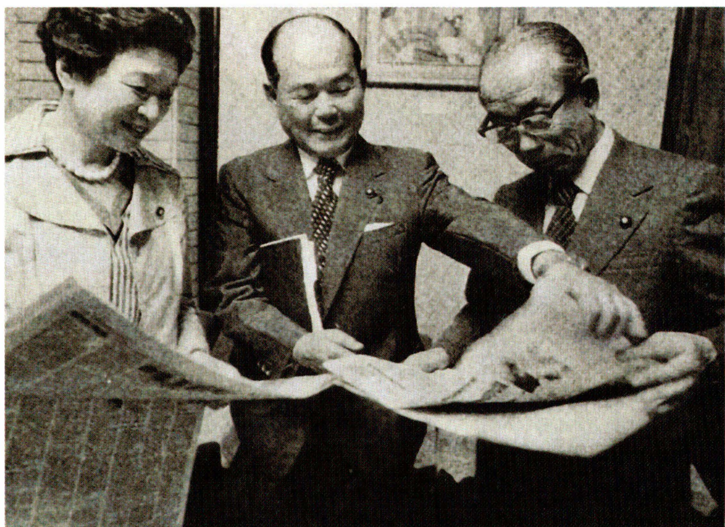
মার্চ ১৯৭৬, ঢাকায় তৎকালীন সামরিক বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে হায়াকাওয়া



২৯ অক্টোবর ১৯৭৭, ঢাকার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে হায়াকাওয়া



২৯ অক্টোবর ১৯৭৭, ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদের সরকারি বাসভবনে বাঁ থেকে জাপানি সাংসদ শিযুয়ে ইয়ামাগুচি, এ জি মাহমুদ, তাকাশি হায়াকাওয়া ও দোভাষী



নভেম্বর ১৯৭৭, টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকেও ফুকুদার কাছে সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে অবহিত করছেন মি. হায়াকাওয়া এবং শিযুয়ে ইয়ামাগুচি